প্রথম অধ্যায়
মালদহ জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. মালদহ জেলা ঃ ভৌগোলিক পরিচয় —

"খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও সুবিস্তীর্ণ গঙ্গার জলরাশির মধ্য হইতে নূতন নূতন দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছিল। বর্তমান যুগের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, খুলনা, ২৪ পরগণা এই সকল জেলার উৎপত্তির বহু পূর্বে সমুদ্রগর্ভ হইতে রাজশাহী, মালদহ, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের উদ্ভব হইয়াছে।"[১]

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার এই মালদহ (চলিতরূপ মালদা) জেলার উত্তরে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা তথা দক্ষিণবঙ্গ, পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য রয়েছে।

মালদহ জেলা 'সমভূমি অঞ্চল ও পলিমাটি অঞ্চলের অর্ন্তগত। জেলাটিকে আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত মহানন্দা নদী দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। এর উত্তরের পলি গঠিত সমভূমি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নির্গত নদ-নদী, বায়ু ও জলের ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে উন্মুক্ত শিলাস্তর ও পলিস্তরে ঢাকা একটি ঢালু পলি সঞ্চিত পাখা ও শঙ্কু বিশিষ্ট (Alluvial fans and cones) পাদদেশীয় পলল সমভূমিতে পরিণত হয়ে ক্রম-প্রসারিত হয়েছে। এ জেলার পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড় এবং পূর্বদিকে গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী পাললিক মৃত্তিকাপূর্ণ অঞ্চল। মহানন্দার পূর্ব দিকে প্লাইস্টোসিন (Pleistocene) উপযুগের প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত অংশ বরিন্দ অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। ভূবর্ণন বিদ্যায় এর আনুমানিক বয়স ৫০ লক্ষ বৎসর। অন্য দিকে মহানন্দার পশ্চিম ও দক্ষিণের নিম্নভূমি অঞ্চল নবীনতর। এটি নবীন পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত।'[২]

১.১ ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন ঃ

মালদহ জেলা ১৮১৩ সালে গঠনের পর থেকে কখনো রাজশাহী, কখনো ভাগলপুর এর অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে প্রেসিডেন্সি এবং আরও পরে জলপাইগুড়ি বিভাগের অর্ন্তভুক্ত হয়। স্বাধীনতার সময়ে এই জেলা পূর্ব-পাকিস্তান না ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলে। "১৫ই এবং ১৬ই আগষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলাশাসকের অধীনে মালদার শাসন কাজ চলে। কিন্তু রাডক্লিফ রোয়েদাদের রায় অনুযায়ী ১৭ই আগষ্ট মালদার শাসনভার পশ্চিমবঙ্গের এক জেলাশাসকের হাতে হস্তান্তরিত হয়।'[৩] গঙ্গা ভাঙনের ফলে এই জেলার মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে চলে। ফলে ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন বদলেছে। G.E. Lambourn সাহেব ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন — "The district of Malda, which with that of Dinajpur forms the western portion of the Rajshahi Division of Bengal, lies between 24°30′ and 25°32′30″ north latitude and 87°48′ and 88°33′30″ east longitude. It extends over 1,899 squere miles and is bounded on the north by the Purnea and Dinajpur District, on the east by Dinajpur and Rajshahi, on the south by Murshidabad and on the west by Murshidabad, the Sonthal Parganas and Purnea[৪] আবার 'District Census Handbook, 1961' এর বিবরণে পাই 'Latitude North 25°32′08″ N, South 24°40′20″ N, longitude East 88°28′10″ E, West 87°45′50″ E[৫] অনুরূপ বিবরণ পাই — "The district is situated between The latitudes

25°32′08″ and 24°40′20″ in the northern hemisphere, and is situated entirely to the north of the tropic of cancer. The eastern most extremity of the district is marked by 88°28′10″ of langitude and its western most extremity by 87°45′50″ to lougitude. The area of the district according to the Surveyor-General of India is 1436 square miles.[৬]"

স্বাধীনতার আগে মালদহ জেলার আয়তন ১৮৯৯ বর্গমাইল ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীতে মালদহ জেলার অন্তর্গত শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল এবং নবাবগঞ্জ থানাগুলি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত হয়। স্বাধীনোত্তর মালদহ জেলার আয়তন ১৪৩৬ বর্গমাইল। এর ফলে জেলার অবস্থানগত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের পরিবর্তন ঘটে।

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় এই জেলার অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে "Maldah is located at the latitude from 25°32′08″ to 24°48′20″ in the north and at the longitude from 88°28′0″ to 87°45′50″ in the east. The district covers on area of 3773 sq. Kms."[৭]

আবার ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় মালদহ জেলার অবস্থান সম্পর্কে লেখা হয়েছে –"The District of Maldah is located between 24°40′20″ and 25°32′08″ North latitudes and 87°45′50″ and 88°28″ East longitudes. It is bounded on the north by the state of Bihar and the district of Uttar Dinajpur and Dakshin Dinajpur, in the South-west by the river padma. Ganga and on the other side of Ganga is situated the state of Jharkhand , is the South by the district of Murshidabad and the east by part of Dakshin Dinajpur District and Bangladesh.[৮] আবার 'District statistical Handbook Maldah 2006-এ মালদহ জেলার আয়তন সম্পর্কে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের 'District Census Handbook'[৯] এ এর তথ্যকেই সমর্থন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে মালদহ জেলার আয়তন ছিল ১৮৯৯ বর্গমাইল। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছে ৩৭৭৩ বর্গ কিমি। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছে ৩৭৩৩ বর্গকি.মি.। ১৯৯১ থেকে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ জেলার আয়তন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ নদীভাঙ্গনে বহু জমি তলিয়ে যাওয়া। অবশ্য এর পাশাপাশি বেশ কিছু চর জেগে উঠেছে, যেগুলির সবকটির পরিমাপ এখনও হয়নি এবং কয়েকটিকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সমস্যাও রয়েছে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে মালদহ জেলা মোট ১৫টি ব্লক নিয়ে গঠিত। এই ব্লকগুলির আয়তন দেখলেই মালদহ জেলার আয়তনের স্বরূপটি বোঝা যাবে।

ব্লকের নাম	আয়তন (বর্গকি.মি.)
হরিশ্চন্দ্রপুর - ১	১৭১.৪১
হরিশ্চন্দ্রপুর - ২	২১৭.২১
চাঁচল - ১	১৬২.১৪
চাঁচল - ২	২০৫.২২
রতুয়া - ১	২৩০.৫৩
রতুয়া - ২	১৭৩.৯৩

ব্লকের নাম	আয়তন (বর্গকি.মি.)
গাজোল	৫১৩.৬৫
বামনগোলা	২০৫.৯১
হবিবপুর	৩৯৬.০৭
ওল্ডমালদা	২১৫.৬৬
ইংরেজবাজার	২৫১.৫২
মানিকচক	৩২১.৭৭
কালিয়াচক - ১	১০৫.৩৭
কালিয়াচক - ২	২২২.৭৩
কালিয়াচক - ৩	২৬০.১২

পৌরসভার নাম	আয়তন (বর্গকি.মি.)
ওল্ডমালদা	৯.০০
ইংরেজবাজার	১৩.৬৩
মোট আয়তন	৩৭৩৩.০০

১.২ ভৌগোলিক বিভাগ ও ভূ-প্রকৃতি ঃ

মালদহ জেলাকে ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা – বরিন্দ বা বরেন্দ্রভূমি, টাল এবং দিয়ারা। "The area of the district may be devided into three zones, (1) The borind, (2) The tal and (3) The diara"[৭] মহানন্দা নদী মালদহ জেলায় প্রবেশ করার পর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। নিমাসরাই-এর কাছ থেকে সদরঘাট পর্যন্ত কিছুটা পূর্বমুখী হয়ে আবার দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীটি মালদহ জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দু-ভাগে ভাগ করেছে। পূর্ব অংশটিকে বরিন্দ অঞ্চল নামে অভিহিত করা হয়। আর গঙ্গার একটি শাখা নদী কালিন্দ্রী বা কালিন্দী মালদহ জেলায় প্রবেশ করে এঁকেবেঁকে সাধারণত পূর্বমুখী, কখনো বা দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে নিমাসরাই-এর কাছে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। এই কালিন্দী নদীর উত্তর অংশটি টাল অঞ্চল আর কালিন্দী নদীর দক্ষিণ অংশ, কালিন্দী ও মহানন্দার সংযোগস্থল থেকে মহানন্দার বাংলাদেশে প্রবেশ পর্যন্ত মহানন্দার গতিপথের পশ্চিম অংশ এবং রাজমহলের কাছে গঙ্গার প্রবেশের পর থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথের বামদিকের অংশ মিলে যে ভূভাগ তাকে বলা হয় দিয়ারা। ভৌগোলিক বিভাজনের সাথে সাথে এই তিন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির তারতম্য রয়েছে। অঞ্চলগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল —

ক) বরিন্দ বা বরেন্দ্র অঞ্চল ঃ

এই অঞ্চলটি মালদহ জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ। এই অঞ্চলে লালমাটি দেখা যায় এবং এর ভূমিরূপ উঁচু-নীচু। "এর মাটি তরঙ্গায়িত। গঙ্গাতল থেকে ঐসব তরঙ্গের উচ্চতা দেড়শ থেকে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐ মাটির তল দিয়ে

চলে গেছে অনুরূপ তরঙ্গায়িত একটি গ্রানাইট পাথরের স্তর। এ স্তরকে কোন আধুনিক যন্ত্রও ফুটো করতে সক্ষম নয়। তাই ঐ মাটিতে কোথাও কোথাও গভীর নলকূপ বা কোথাও কোথাও অগভীর নলকূপ বসানো সম্ভব হয় না।[১১] ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কম। চাষবাস ও পানীয় জলের জন্য প্রচুর পুকুর এই অঞ্চলে বর্তমান। 'মালদহ জেলার মোট প্রায় ২৯ হাজার পুকুরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার এই অঞ্চলেই রয়েছে। এই পুকুরগুলির মধ্যে ১ হাজার বাদে ১৯ হাজারই ৪০০ থেকে ২ হাজার বছরের পুরনো।'[১২] এছাড়াও এই অঞ্চলে প্রচুর খালবিল রয়েছে। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল পুণর্ভবা, টাঙ্গন, ব্রাহ্মনী, শ্রীমতি বা ছিরামতি এবং হাঁড়িয়া। মহানন্দা নদীটি এর পশ্চিমদিকের সীমা নির্দেশ করে।

ওল্ড মালদা, গাজোল, হবিবপুর এবং বামনগোলা এই চারটি ব্লক নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। পূর্বে এই অঞ্চলকে বরেন্দ্র ভূমি বলা হত যার সীমা পূর্বে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনেকে[১৩] মনে করেন। প্রাচীন এই বরেন্দ্রভূমির রাজধানী ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন, যার বর্তমান নাম পাণ্ডুয়া।

এই অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ল্যাম্ববার্ণ লিখেছেন – 'The river Mahananda flowing north and south roughly devides the district into two equal parts, corresponding by local tradition to the old boundary line of the Rarh and Barendra. To this day the country of the east of the Mahananda is called the barind. Its characteristic feature is the relativety high land of the red clay soil of the old alluvium.'[১৪]

এই অঞ্চলের ভূমিরূপ ডাঙ্গা (উঁচু জমি) কান্দর (মাঝারি উচ্চতা ও বর্ষার জল বয়ে যায় এমন), আর কান্দর (অপেক্ষাকৃত নীচু) ও ডুবা (খুব নীচু) নামে অভিহিত।

খ) টাল অঞ্চল ঃ

মহানন্দার পশ্চিম ও কালিন্দী নদীর উত্তর অংশের ভূভাগটি মালদহ জেলায় টাল অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের মাটি কালচে ও নীলাভ। 'এক কালে কুশী যেখান দিয়ে বইত তার মাটির রঙ কালো। ফুলহরা ও গঙ্গা বিধৌত মাটির বর্ণ নীলাভ।'[১৫] টাল 'এর আক্ষরিক অর্থ জলাভূমি অর্থাৎ জলা, বিলে পরিপূর্ণ।'[১৬] আবার স্থানীয় অঞ্চলে 'টাল' কথাটির অর্থ একপাশে সামান্য হেলে যাওয়া বা ঢালু হয়ে যাওয়া। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ভূমিরূপ উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। এই অঞ্চলটি বরিন্দ অঞ্চলের থেকে নীচু। রতুয়া - ১ ও ২, চাঁচল - ১ ও ২, হরিশ্চন্দ্রপুর - ১ ও ২ ব্লকগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশের ভূমিরূপের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও ইটাহার ব্লকের সাদৃশ্য অনেকটাই। শুধু রতুয়া অঞ্চলের গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের মাটি একটু পৃথক। এই এলাকার মাটি বরিন্দ এলাকার মতো এঁটেল ভাবের নয় বরং অনেকটাই বালি মিশ্রিত দোঁয়াশ প্রকৃতির। Lambourn এই অঞ্চলের প্রসঙ্গে লিখেছেন — "West of the Mahananda the country is again divided into two well defined parts by the Kalindri river flowing west and east from the Gangas. North of the Kalindri the distinguishing natural feature is the tal land, the name applied to the land which floods deeply as the rivers rise, and drains by meandaring streams into swamps or into the Kalindri. There are extensive tracts of this land covered, where not cultivated with tall grass in Ratua and Tulsihata thanas."[১৭]

গ) দিয়ারা অঞ্চল ঃ

মালদহ জেলায় মহানন্দা ও কালিন্দীর মিলিত অংশের পশ্চিম, কালিন্দীর দক্ষিণ এবং গঙ্গা নদীর স্রোত প্রবাহের বামদিকের অংশই দিয়ারা নামে কথিত। যদিও দিয়ারার বৃহত্তর অংশ রতুয়া ও মুর্শিদাবাদেও বিস্তৃত। "উইলসনের মতে, নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য পাড় সংলগ্ন নতুন জমি বা প্রবাহের মধ্যে উত্থিত চর জমিই হল দিয়ারা।"[১৮] 'এর উৎপত্তি এভাবে – দ্বীপ > দিয়া + ড়া (সাদৃশ্যার্থে), যার অর্থ চর বা চড়া।'[১৯]

এটি মালদহ জেলার মানিকচক, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর এবং ইংরেজবাজার থানা নিয়ে গঠিত। এর সঙ্গে রতুয়ার কিছু অংশকে এই অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত করা চলে, ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে। পুরানো নথিপত্র থেকে জানা যায় যে গঙ্গা এই জেলায় বারে বারে তার নদীখাত পরিবর্তন করেছে এবং বর্তমানেও এই ক্রিয়া চলছেই। এ সম্পর্কে Lambourn লিখেছেন – "South of the Kalindri lies the most fertile and populous portion of the district. It is seamed throughout by old courses of Ganges, upon the banks of one of which the city of Gour once stood. The most striking natural feature is the continuous line of islands and accretions formed in the bed of the Ganges by its even charging currents and known as the diara.[২০]

বর্তমানে গঙ্গার অবস্থান দেখলে বোঝা যায় যে গঙ্গার অবস্থান পূর্বের চেয়ে অনেকখানি সরে গেছে এবং যে বিস্তৃত ভূ-ভাগের সৃষ্টি করেছে তা সম্পূর্ণতই নদীর পলি দ্বারা গঠিত। এটি জেলার নবীনতম অংশ। এর মাটির রং নীলাভ।[২১] এই মাটি খুব উর্বর। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলেই প্রচুর পরিমানে আম ও তুঁতবাগান দেখা যায়। রেশম চাষও এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হয়। একসময় কাঁটাঝোপে পূর্ণ ছিল বলে এই অঞ্চলের কিছু অংশ 'কাঁটাল' নামেও পরিচিত।

১.৩ নদ-নদী ও খালবিল ঃ

ভারতবর্ষের প্রধান নদী গঙ্গা;। মালদহ জেলার অনেকটা সীমানা বরাবর প্রবাহিত। এছাড়াও মহানন্দা, কালিন্দী বা কালিন্দ্রী, ভাগীরথী, ফুলহার, টাঙ্গন, পুর্ণভবা, পাগলা, বেহুলা ইত্যাদি নদী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত। এই জেলার নদ-নদীগুলি এরূপ —

- গঙ্গা ঃ

হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের দ্বারা সৃষ্ট ও গোমুখ নামক স্থান থেকে উৎসারিত হয়ে এবং বহু উপনদীর জলধারায় পুষ্ট ও আরও বেগবতী হয়ে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে রাজমহল পাহাড়ের কাছে এসে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এখানেই গঙ্গা প্রথম এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং এখান থেকেই তার নিম্নগতির শুরু। রাজমহলের কাছ থেকে গঙ্গা মালদহ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা চিহ্নিত করে এগিয়ে গেছে এবং ফরাক্কা পেরিয়ে ধুলিয়ান এর কাছে গেরিলা বা ছাবঘাটিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি ভাগ পদ্মা নামে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ও অন্য ধারাটি মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ভাগীরথী, হুগলী নাম নিয়ে কলকাতা বন্দর ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে। এই নদী এই জেলায় বারে বারে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ফলস্বরূপ গঙ্গাভাঙন ও হঠাৎ করে চর জেগে ওঠা এই জেলার নিত্যসঙ্গী। ভূতনী দিয়ারাসহ এই জেলায় গঙ্গার মধ্যেই প্রায় ২০টিরও বেশী চর রয়েছে। সেগুলির অধিকাংশেই মানুষ বসবাস করে।

● মহানন্দা ঃ

দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এর পাগলাঝোড়া জলপ্রপাতের জলধারায় পুষ্ট হয়ে এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ি ঝরণা জলে সমৃদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা এবং বিহারের বেশ কিছুটা অংশ অতিক্রম করে, বিহারের বারসই সংলগ্ন বাগজোবের কাছে পৌঁছে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি ধারা মহানন্দা নামে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। 'মহানন্দা মালদহ জেলার মাঝ বরাবর অর্ধচন্দ্রাকারে বইছে। ফলে সে এ জেলার মাটিকে প্রায় আধাআধি আমপাতার দুটো ভাগের মত ভাগ করেছে। এর গতি উত্তর-দক্ষিণে।[২২] অবশ্য নিমাসরাইয়ের কাছে এসে এই নদী সামান্য পূর্ববাহিনী হয়ে ওল্ডমালদা ও ইংরেজবাজার শহরকে আলাদা করে দিয়ে সদর ঘাটের কাছ থেকে আবার দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর জেলার দক্ষিণ সীমা পার হয়ে বাংলাদেশের বাদাগাড়ির কাছে পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। সে কারনে মহানন্দাকে পদ্মার উপনদী বলা হয়। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুরের কুলিক নদীর জল নাগরের সঙ্গে মিশেছে এবং কুলিক ও নাগরের মিলিত জলধারা মহানন্দায় এসে মিশেছে। এছাড়াও ডোক, বালাসন, মেচি, কানকাই, পানার, টাঙ্গন, পুর্ণভবা, কালিন্দ্রী নদীর জলও মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

● ফুলহর / ফুলহরা ঃ

মহানন্দা নদীরই আরেকটি শাখা বিহারের বারসইয়ের বাগজোবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফুলহরা নাম নিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করেছে এবং জেলার পশ্চিম-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভূতনী দিয়ারার কাছে গঙ্গায় মিশেছে।

● কালিন্দ্রী / কালিন্দী ঃ

এই নদীটি গঙ্গানদীরই একটি শাখা। এটি বিহার থেকে এসে এ জেলায় প্রবেশ করেছে। এটি সাধারণত পূর্বমুখী হয়ে প্রবেশ করলেও কখনো পূর্ব এবং কখনো বা দক্ষিণ-পূর্ব এইভাবে অনেকগুলি বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিমাসরাই-এর কাছে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

● পুর্ণভবা ঃ

এই নদীটি পূর্বে তিস্তা নদীর একটি অন্যতম স্রোতধারায় পুষ্ট ছিল। পরবর্তীতে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর এটি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ থানার ব্রাহ্মণপুকুর বিল[২৩] থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মালদহ জেলার বরিন্দ অঞ্চলের পূর্বভাগে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে কিছুটা প্রবাহিত হওয়ার পর মহানন্দায় মিশেছে। বামনগোলা থানার কিছু কিছু জায়গায় এই নদী কয়েকটি খাদের সৃষ্টি করেছে। যার কিছুটা অংশ হাঁড়িয়া নদী[২৪] নামে এই অঞ্চলে পরিচিত।

● টাঙ্গন ঃ

হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'মহানন্দার বিশিষ্ট উপনদ টাঙ্গন।[২৫] জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বাংলাদেশে ঢুকেছে। তারপর উত্তর দিনাজপুরের সামান্য কিছু অংশে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবেশ করেছে। এরপরে এটি মালদহ জেলার বরিন্দ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মুচিয়ার কাছে মহানন্দায় মিশেছে।

● ভাগীরথী ঃ

মালদহের ভূতনী দিয়ারার কাছ থেকে গঙ্গার একটি শাখা অন্যপথে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে এবং পঞ্চানন্দপুর, সাতটারী, শার্দুল্লাপুর / সোদ্‌লাপুর, মধুঘাট, গৌড় ও মহদিপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে। এই

ভাগীরথী ও দক্ষিণবঙ্গের ভাগীরথী কিন্তু এক নদী নয়। ''অনেকে মনে করেন যে, একাদশ দ্বাদশ শতকে এই জলস্রোতকে গঙ্গার মূল ধারার থেকে খনন করে আনা হয়েছিল। গৌড় নগরীতে জল সরবরাহের প্রয়োজনেই না কি এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[২৬]

● পাগলা ঃ

পঞ্চানন্দপুরের কাছে ভাগীরথীর মূল ধারা থেকে বেড়িয়ে এসে মালদহ জেলার বাঙিটোলা ও মোথাবাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালিয়চকে এসেছে। এখানে গঙ্গার আরেকটি শাখানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শাখাটি গঙ্গার মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে ফরাক্কার চরবাবপুর এলাকা থেকে। দুই পাগলা কালিয়াচকে মিলিত হয়ে মহদিপুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।[২৭]

● বেহুলা ঃ

সাহাপুর অঞ্চলের নিম্নজলাভূমি থেকে উৎসারিত হয়ে বাংলাদেশের নবাবগঞ্জের কাছে মহানন্দায় মিশেছে। এর গতি উভয়মুখী। বর্ষাকালে মহানন্দা স্ফীত হলে তার গতি চলে উজানে এবং শীতকালে মহানন্দার জল কমে গেলে এর গতি হয় ভাটিতে। এটি মহানন্দারই প্রশাখা বা খাল।[২৮] লোকশ্রুতিতে এই নদী দিয়ে বেহুলা লখীন্দরের শব মান্দাসে করে কালিন্দীতে ভেসেছিল।[২৯] বেহুলা এর উপর দিয়ে ভেসে ছিল তাই এই নদীর নাম বেহুলা।

● বুড়ী গঙ্গা ঃ

রতুয়ার কাছে কালিন্দী ও গঙ্গার পুরোনো খাতের সংযোগস্থল বুড়ীগঙ্গা নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত। কেবলমাত্র বর্ষাকালেই এটি নদীর আকার ধারন করে। এছাড়াও ছোট ভাগীরথী, শ্রীমতি ব ছিরামতি, কালকোশ, কঙ্কর, কোশ, বারমাসিয়া নামে কয়েকটি ছোট ছোট উপনদী আছে।

● বিল ঃ

মালদহ জেলায় নদ-নদীর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি খাল ও বহু সংখ্যক বিল রয়েছে। আবার বিল অর্থ চাব। টাল, বরিন্দ ও দিয়ারা এই তিনটি অঞ্চল ভেদে বিলগুলির অবস্থান নিম্নরূপ।৩০

** টাল অঞ্চলের বিলসমূহ ঃ

কথিত আছে একসময় কুশী নদী মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। এখন এটি বিহারে সরে গেছে। কিন্তু রেখে গেছে অনেক জলাভূমি। এই অঞ্চলের বিলগুলি হল — আধসই, আধিগৌড়চাব, চামলিয়া, খাঁড়ি, হাজার টাকিয়া, গারিয়া, গোল্ডবোল্ড, সনক, খাসিমারি, পতিবনা, কোয়া, সিংসার, সোনাইগুড়ি, ঢেকুল, মান্না, চুমুরিয়া, কাচুর, শিয়ালি, কাপাইচণ্ডি (হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ ও ২ নং ব্লক) বওয়ালিয়া, বড়কাঠান, ছোটকাঠান, কনার, চন্দ্রসাহী-১, চন্দ্রসাহী, ডোমাইপুর, ছাপরা, সোনাখাড়ি, চেঙ, কেন্দ্র, বারোশিংহা, সারাবানি (চাঁচল-১ ও ২ নং ব্লক), গুরপাবিয়া, ভগা, মেচুয়া, গুহুলাল, ভায়ারবারি, পাতিকন, গোলবাঁকা, বারবিল্লা, নয়াকোল, চুনাখালি। এছাড়াও আরও ছোট ছোট অনেক বিল রয়েছে।

** বরিন্দ অঞ্চলের বিলসমূহ ঃ

বরিন্দ অঞ্চলেও প্রচুর বিল রয়েছে। এগুলি হল – বলাতুলি, কালুয়ারি, কোয়ার, মাধাইপুর, জলকরবিথান, পুতুল, নয়াবাঁধ, বাকলা,পাদুয়াবাঁধ, বড়বিকান, ছোটবিকান, আধারকটা, বিকান, রামডোল, মহাদেবপুর, চারলা, মনডোলা-১, মনডোলা-২, কাঞ্চন, পিথার, ভবানী, কেন্দ্র, মরানদী, মোহানা, প্রজাপতি, পূর্বা, লোহাচরা, দিগধারি, আলতার, মতিকাটা,

মতিকাঁটা-১, মতিকাঁটা-২, শান্তিপুর, ঘাহারা, শশুলি, ঢালমারি, বামন, দৌলতপুর, চারখোলা, চাতরা, শংকর, শিমলা, কুরাল, ডাকরন, সূর্য, তেলি, আইরমারি, আলন্দা, থানার ঢোকা, সুবার্ণি, হরিশ্চন্দ্রপুর, রুইমারি, শ্রীরাম নামাঙ্কিত বিল। এছাড়াও আর কিছু ছোটখাটো বিল রয়েছে।

**** দিয়ারা অঞ্চলের বিলসমূহ ঃ**

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর থানায় যেসব বিল রয়েছে, সেগুলি হল – গাবগাছি চাতরালবিল, গাবগাছি-১, গাবগাছি-২, সোনাতলা, অভিরামপুর, ভিওয়া, রুইমারি, নন্দার, বাহাগালা, চিরাকেল্টি, নয়াগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কাজিগ্রাম, অমৃতি ঢাব, মালিহা ইত্যাদি নামাঙ্কিত বিল। এছাড়াও আরও কিছু ছোট খাটো বিল রয়েছে।

- দিঘি ঃ

মালদহ জেলায় বেশ কিছু পুকুর বা দিঘি রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাগরদিঘি, কাজলদিঘি, রূপসাগর, পিয়াসবাড়ি দিঘি, রাইখান দিঘি, হাসিমারি দিঘি, গর্ণা দিঘি, শুকান দিঘি, ট্যামনা দিঘি, তেসতিনা দিঘি, ছোটসাগর দিঘি, সাতাইশঘরা দিঘি, ধানুয় দিঘি, আটবাগ দিঘি, প্রাণ দিঘি। এছাড়াও আরো কিছু দিঘি রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি পরিমান পুকুর রয়েছে বরিন্দ এলাকায়। মালদহ জেলার ২৯ হাজার পুকুরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই পুকুরগুলির মধ্যে ১ হাজার বাদে প্রায় ১৯ হাজারই ৪০০ থেকে ২০০০ বছরের পুরানো।[৩২]

১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ

মালদহ জেলার অঞ্চল ভেদে (বরিন্দ, টাল ও দিয়ারা) ভূ-প্রকৃতি যেমন পৃথক, তেমনি এই জেলার আবহাওয়া ও অঞ্চলভেদে পরস্পরের থেকে একটু ভিন্ন। বরিন্দ অঞ্চলের আবহাওয়া একটু বেশি উষ্ণ, অন্য দুটি অঞ্চলের চেয়ে। গঙ্গা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া এই জেলার অন্য অংশগুলি থেকে একটু আলাদা। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে তীব্র ঠাণ্ডা এই জেলার আবহাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্ষাকালে কখনো কখনো এমন বৃষ্টিপাত হয় যে তা বন্যার আকার ধারণ করে। এই জেলার নদীগুলি নিম্নগতি হওয়ার জন্য বেশ কিছু এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা বা বান হয়। (বিশেষতঃ গঙ্গা ও ফুলহরা'য়)। আবার কোনও কোনও বছর স্থানীয়ভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত না হলেও বন্যা হয়। বিশেষতঃ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাতের জল গঙ্গা নদী হয়ে এই জেলায় প্রবেশ করে ভয়াবহ বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "... not from local rainfall, but from and abnormal rise in the rivers, of which the most important is the Ganges. Most of the rivers and streams which flow through Malda take their rise in the northern mountains, and are therefore peculiarly laible to sudden freshets caused by the melting of snow and excessive rainfall in the hills."[৩৩] আবার কোন কোন বছর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটলে বরিন্দ সহ জেলার অন্যান্য অংশে খরা লক্ষ্য করা যায়। আবার বছরের বিভিন্ন সময়ে ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় তাণ্ডব চালায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত শীতকাল। মাঝে মধ্যে কুয়াশা পড়ে। এই সময়ে বৃষ্টিপাত হলে কিম্বা বিহার-ঝাড়খণ্ডের দিক দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ হলে শীত জাঁকিয়ে বসে। গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা 'ঘুর' বা আগুন পোহায়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম হাওয়া বয়। সূর্যের প্রখর তাপ গরমকে আরও বাড়িয়ে দেয়। 'লু'বয়। এই সময় দিনের বেলায় প্রচণ্ড গতিতে 'পছিয়া' (পশ্চিমা) বাতাস বয়।

১.৫ কৃষি ও কৃষিজাত ফসল ঃ

'মালদহ জেলার শতকরা ৯২.৬৮ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। যার অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যার ২০.৮৩ শতাংশ কৃষক আর ৩০.৭২ শতাংশই কৃষিশ্রমিক।'[৩৪] বরিন্দ অঞ্চলে এঁটেল মাটি হওয়াও গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর ব্লকে প্রচুর ধান চাষ হয়। টাল অঞ্চলের হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, রতুয়া ব্লকেও ধান ও পাট চাষ হয়। দিয়ারা অঞ্চলের কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর ও ইংরেজবাজার থানায় ধান ও পাটের চাষ হয়। মানিকচক ও ইংরেজবাজার ব্লকের কিছু কিছু জায়গায় ভাল পাট চাষ হয়ে থাকে। প্রায় সমগ্র জেলা জুড়ে গমেরও চাষও ভাল হয়। দিয়ারা ও টাল অঞ্চলে ভুট্টা চাষ ভাল হয়। মসুর, কলাই, খেসারি, তিসি ইত্যাদিও চাষ হয়। কালিয়াচক-১,২ এবং ৩ নং ব্লকে রেশমচাষ খুব ভালো হয়। আম, লিচু, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমানে হয়। তন্মধ্যে এই জেলার ফজলি আম বিখ্যাত। W.W. Hunter সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় — "The principal features of this central portion of the district are the mango groves, the mulberry lands and the tanks Mango gardens are to be found in every village and are particularly thick along the Kalindri and Mahananda rivers."[৩৫]

১.৬ উদ্ভিদ ও বনভূমি ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে Pemberton তাঁর Revenue Servey তে উল্লেখ করেছেন যে সে সময়ে মালদা জেলাতে জঙ্গল এবং জলাভূমি এতই বড় আকারে বিস্তৃত ছিল যে গণ্ডারসহ বিভিন্ন রকম বন্যপ্রাণীর আবাসভূমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখীতে ভরা ছিল। আবার W.W. Hunter সাহেব Statistical account of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গৌড় এবং পাণ্ডুয়ার পতনের পর শুধু বাঘ নয়, অন্য পশু এবং সরীসৃপরা হানা দিত। বাঘ, চিতা, নেকড়ে (কম), গণ্ডার (খুব কম), বন্য শুয়োর, বন্য মহিষ, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ ইত্যাদি দেখা যেত। তবে এই এলাকায় রেলপথ তৈরী করার প্রয়োজনে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে।

এই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে আম গাছ। এছাড়া – জাম, কাঁঠাল, নিম, নারকেল, তাল, খেজুর, শিমূল, পিপুল, বট, অশ্বত্থ, শিশু, তেঁতুল, বাবলা, লিচু, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, আতা, বাঁশ, কলাগাছ, সজনে, তুঁত, ডুমুর, আমড়া, বেল, পিটুলি, কুল ইত্যাদি লক্ষ্যনীয়।

২০০৩ সালের তথ্যানুসারে এই জেলার মোট বনাঞ্চল ছিল ১,৬৯৪.৩০ হেক্টর। এর মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল ৮০৫.৫০ হেক্টর।[৩৬] মোট বনাঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকার বন রয়েছে। আদিনাতে একটি কৃত্রিম বন রয়েছে যা Deer Park নামে পরিচিত। অনুরূপ একটি বনভূমি হরিশ্চন্দ্রপুরেও রয়েছে।

২. ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ

মালদহ জেলা ইতিহাস সমৃদ্ধ। এই জেলার ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে – গৌড়, পাণ্ডুয়া, আদিনা, রামকেলী, জগজীবনপুর ইত্যাদি। এই জেলার অন্তর্গত গৌড় ও পাণ্ডুয়া একাকালে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। মুসলমান গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী (লক্ষ্মৌটী) ও তাহার উত্তরাংশে হিন্দু গৌড় বা প্রাচীন রাজধানী রামাবতীর ভগ্নাবশেষ

অবস্থিত। এই স্থানে বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ রামকেলী যে স্থানে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলি স্পর্শে পরমপূর্ণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে।[৩৭] ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় এই জেলার ইতিহাস সম্পর্কে বিবরণ বেশ মনোগ্রাহী – "In the anciant time, it was a part of the kingdom of Paundrabardhana ruled by Paundra, the youngest son of king Bali. The area was an important unit of administration of the Gupta Empire during the reign of emperor Samudra Gupta. Dharmaditya was an independent king of this area in 3rd century. A.D. In 5th century. A.D. Ishan Barma, the king of Magadha attacked this area and ruled over there for a considerable period of time. During the rule of Sasanka the area was called "Gaur" and during this reign the kingdom was independent and powerful in the Eastern region of the country. He changed the name of 'Pundra Bardhan' into 'Gour' and established his own kingdom. In 600 A.D. Gopaldev became the king of Gour and he made the kingdom of Gour a powerful one with the capital at Gour town, 16 miles north east at Maldah Town. In the 7th century, during the rule of pala kings like Dharmapala and Devpala, the kingdon of Gour flourished as a great power of Bengal. More over, during the rule of Ballal Sen of the Sen Dynasty in 12th century and 13th century Gour as a state became very powerful in the country. But unfortunately, during the reign of king Lakshman Sen, the rule of Hindu kings in the History of Bengal came to an end. After the advent of the Muslim period in Bengal, Ilias shaw founded a powerful kingdom of Gour. Sultans like Nasiruddin and Hasan Shaw (1493-94) consolidated their position and controlled the different parts of Bengal from the twin cities of Gour and Pandua. The kingdom of Gour became an important centre of trade during the Medieval period of history of Bengal. During 1676, the Dutch built a kuthi in Maldah town for trading purpose."[৩৮]

এ পর্যন্ত মালদা জেলার পাল রাজাদের তিনটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। সেগুলি ঃ

১. ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন ঃ মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার গৌড়ের সন্নিকটে খালিমপুরে (জে.এল. নং - ৩২)

২. দ্বিতীয় গোপালদেব-এর জাজিলপাড়া তাম্রশাসন ঃ মালদার গাজোল থানার জাজিলপাড়া (জে. এল. নং - ১৮৯)

৩. মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন ঃ মালদা জেলার হবিবপুর থানার জগজ্জীবনপুর (জে. এল নং- ৭৩) তুলাভিটার উত্তর-পূর্ব দিকে।[৩৯]

রাজা রামপালের প্রাচীন রাজধানী ছিল রামাবতী। 'রামাবতী' জনপদটি লোকমুখে অপভ্রংশ হয়ে 'অমৃতি'তে পরিণত হয়েছে। 'রামাবতী → আমাবতী → আমারতী → আমৃতি → অমৃতি।[৪০] এখনো স্থানীয় লোকেরা অমৃতিকে 'আমরতী' বলে থাকে। অমৃতি ইংরেজবাজার থানায় অবস্থিত। বর্তমানে অমৃতিতে মহানন্দ শেঠ নির্মিত 'শিবমন্দির'এ শিবরাত্রিতে সপ্তাহব্যাপী বিরাট বড় মেলা বসে। পাল বংশের শেষ রাজা মদনপালের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ছিল বামনগোলা থানার মদনাবতীতে। এই

গ্রামে উইলিয়াম কেরি সাহেব পদার্পণ করেছিলেন। স্কুলও স্থাপণ করেছিলেন। আবার সেন বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা বল্লালসেন-এর রাজপ্রাসাদ ছিল এই জেলার 'ইংরেজবাজার থানার বল্লাল বাড়ী নামক স্থানে যা বর্তমানে বাঘবাড়ী বা বাগবাড়ী নামে পরিচিত।[৪১] লক্ষ্মণ সেনের রাজধানীও ছিল ইংরেজবাজার থানার বর্তমান সাগরদিঘির কাছে। মালদহ বা মালদা জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান – গৌড়, পাণ্ডুয়া ও টাঁড়া। মুসলমান সুলতান, বাদশাহদের রাজত্বকালে এগুলি গৌড়ের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে মালদার এগুলি স্থানেই ছিল। 'গৌড়' বলতে বুঝি হোসেন শাহের গৌড়। ''খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব ভারতে গৌড় মুসলিম শাসকদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র হয়েছিল।[৪২] এই গৌড় মালদা শহর থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে আজও মুসলিম শাসক আমলের কিছু ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্যকীর্তি দণ্ডায়মান। যেমন - ফিরোজ মিনার, দাখিল দরওয়াজা, চাঁদ দরওয়াজা, বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারী, হোসেন শাহ'র সমাধি, চিকা মসজিদ, কদম রসুল (এখানে কালো পাথরে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন আছে), লোটন মসজিদ ইত্যাদি। 'Mr. Reuben Barrow'-র ১৭৮৭ সালে গৌড় ভ্রমণের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা গেছে যে, নগরের অসংখ্য অট্টালিকা, রাজপ্রসাদ, মসজিদ, তোরণ ইত্যাদি ইমারতগুলি প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে মানুষের ইঁট-কাঠ ভেঙে নিয়ে যাওয়ার কারণে ধ্বংসাকাণ্ড ত্বরান্বিত হচ্ছে।[৪৩] সুলতান সামসুদ্দিন ইলিহাস শাহের রাজধানী হিসাবে পাণ্ডুয়ার নাম পাওয়া যায়। ছোট সোনা মসজিদ, একলাখি ভবন ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান। উল্লেখ, সেখ শুভদয়া নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি পাণ্ডুয়ার মসজিদ থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীন লোকশ্রুতি রয়েছে যে — মহাভারতের পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় 'পাণ্ডুয়া'তে বসবাস করেছিলেন, তা 'পাণ্ডবরাজ দালান' বলে পরিচিত। এই সময়ে অর্জুন ১টি দিঘি খনন করেন তা 'অর্জুনদিঘি' নামে পরিচিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনি মালদাবাসীর কাছে অবিস্মরণীয়। বেহুলা পুরাতন মালদায় যে নদীর উপর দিয়ে স্বামীর শব নিয়ে ভেসে গিয়েছিলেন তার নাম 'বেহুলানদী'। এই নদীর ধারে প্রতি বছর মূলা ষষ্ঠীতে জুয়ারীর মেলা বসে। জনশ্রুতি রয়েছে – পুরাতন মালদার বধূরা ঘাটে বেহুলাকে শব নিয়ে ভেসে যেতে দেখে কটূক্তি করেছিল বলে বেহুলা অভিশাপ দেন। ফল – বৈধব্যদশা। তাই ওখানে নাকি বিধবার সংখ্যা বেশী। আবার যাত্রাডাঙার বধূরা বেহুলার প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আশীর্বাদ লাভ করেছিল। ফল – শিশু মৃত্যু বন্ধ। (ইদানিং অবশ্য শিশু মৃত্যু ঘটছে) শিখ গুরু নানক পুরাতন মালদহে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর পূন্য স্মৃতি হিসাবে সেইখানে নির্মিত হয়েছে একটি দর্শনীয় গুরুদ্বার। গুরুনানকের জন্মদিনে প্রচুর শিখরা সেখানে আসেন। বাণিজ্যনগরী হিসাবে মালদহ উল্লেখযোগ্য ছিল। (মালদহ বলতে বর্তমানে পুরাতন মালদহ বোঝায়)

''ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে পুরাতন মালদহের খ্যাতির পিছনে ছিল তার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান। এই অঞ্চলটা ছিল চারিদিকে নদী দিয়ে ঘেরা, একদিকে মহানন্দা অন্যদিকে বেহুলা। আবার এখানে এসে মিলেছে গঙ্গার শাখানদী কালিন্দ্রী এবং অন্যপারে এসে মিলেছে উত্তর বাংলার টাঙ্গন। এইভাবে চারনদীর মহাসঙ্গমের অবস্থিতি এবং গঙ্গার নৈকট্য এই শহরকে করে তুলেছিল এক শ্রেষ্ঠ নদী বন্দর। 'গঙ্গা থেকে ভল্গা' বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, মালদহের উৎপন্ন দ্রব্য কেমন করে গঙ্গা, ভাগীরথীর মাধ্যমে সাগর পাড়ি দিয়ে ইরাক, ইরান ও কাসপিয়ান সাগর পার হয়ে ভল্গার মোহনায় পৌঁছাত। সুতরাং প্রাচীন মালদহ শুধু ভারতের নয়, তৎকালীন আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যেও খ্যাতি অর্জন করেছিল।''[৪৪] সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ডাচ বনিকরা এখানে এসেছিলেন। ইংরেজ বনিকরাও এখানে আসেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালে এই জেলায় রফিক মণ্ডল ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৪৫] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনে এ জেলায় প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বাধীনতা আন্দোলনে মালদাবাসীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাতে এসেছিলেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বৃন্দাবনী ময়দানে ও নঘরিয়া গ্রামে সুবিশাল সম্মেলন করেছিলেন। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুশীলন সমিতি ও ব্রতী সমিতিরও শাখা মালদায় ছিল।[৪৬] অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্যও মালদহে ছিল। বিশ শতকের কুড়ির দশকে তেভাগা আন্দোলন হয়। ১৯৩২-এ একটি সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন জোরদার হয়। আন্দোলনকারীরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রেললাইন ও টেলিগ্রাফের তার কাটে এবং পোস্টঅফিস ও রেলওয়ে স্টেশনে আগুন লাগায়। কেউ বন্দী হন আবার কেউ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও এই জেলাটি ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের এক জেলাশাসকের অধীনেই ছিল। ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ মালদহ জেলা ভারতের অধীনে আসে এবং একজন জেলাশাসকের হাতে শাসনভার অর্পণ করা হয়। তবে মালদহ জেলার অন্তর্গত ৫টি থানা যথা ভোলাহাট, নাজোল, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অর্ন্তভুক্ত হয়। বাকী ১০টি থানা নিয়ে গড়ে ওঠে স্বাধীনোত্তর মালদহ জেলা। তবে বর্তমানে এই জেলায় ১১টি থানা আছে।

২.১ মালদহ জেলা ঃ গঠন বৃত্তান্ত ঃ

পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা মালদহ এটি উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার। প্রাচীনকাল থেকে পৌণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় জনপদের অর্ন্তভুক্ত এই স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জেলা হিসাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজশাহী, পূর্ণিয়া এবং দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে M.O. Carter লিখেছেন "The district was formed in 1813 out of portions of Purnea, Dinajpur and Rajsahi districts. The prevalence of crime, and the extreme distance of these outlying areas from their district headquarters, rendered closer supervision necessary. Kharba and Harishchandrapur police stations were added to the district in 1896. The district boundary was published by notification in 1875, since when minor transfer in 1929 of Bhutni diara, a large island char in the Ganges, from Santal Parganas to Malda. The district was under the Bhagalpur Division from 1876 until 1905, when it was transferred back to the Rajshahi Division on the formation of the province of Eastern Bengal and Assam. There are no outlying sub-divisions. Proposal have been made for the division of the district into three sub-division."[৪৭] এই জেলা গঠনের যে কারণ তা হল – "১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে Lower province এর সুপারিটেন্ডেন্টে অফ পুলিশ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে পুর্ণিয়া-দিনাজপুর-রাজশাহী জেলার কয়েকটি থানাতে যে ব্যাপকহারে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে তা বন্ধ করতে হলে নতুন এক জেলা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সুপারিটেন্ডেট অফ পুলিশ-এর মতে জেলার সদর দপ্তর থেকে এই থানাগুলি (শিবগঞ্জ, কালিয়াচক প্রভৃতি) বহু দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলেই চুরি ডাকাতি বেড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, জেলার সদর দপ্তর পূর্ণিয়া থেকে কালিয়াচকের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই সুপারিশ মেনে নিয়ে ১৮১৩ সালে এপ্রিল মাসে মালদহ নামে একটি নতুন জেলা স্থাপন করলেন।"[৪৮] অবশ্য ১৮১৩ সালের মার্চ মাসেই এই জেলায় একজন যুক্ত জেলাশাসক

ও উপসমাহর্তা (Joint Magistrate and Deputy Collector) নিযুক্ত হন এবং একজন রেজিষ্ট্রারও নিযুক্ত হন। কিন্তু এই যুক্ত জেলাশাসকের ফৌজদারী, রাজস্ব ও দেওয়ানীর বিষয়ে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় অধিকাংশ সমস্যার সমাধানও হত না। ১৮৩২ সালে মালদায় প্রথম Treasury স্থাপিত হয় এবং সে বছর থেকেই মালদহকে স্বাধীন জেলা হিসাবে ধরা হয়। যদিও ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত Joint Magistrate and Deputy Collector পদটি বহাল ছিল। ১৮৫৯ সালে প্রথম এই জেলার জন্য একজন স্বতন্ত্র Magistrate and Collector নিযুক্ত হলে অন্য জেলাগুলির সমমর্যাদা পায়। "১৮৭৫/ ৭৬ সাল পর্যন্ত এ জেলার জন্য জজও নিযুক্ত হন নি। দিনাজপুরের জজ-ই তিন মাস অন্তর মালদায় এ ব্যাপারে আসতেন এবং সব ফৌজদারী মামলা তাঁর বিচারাধীনে থাকত। ... ১৮৭৫ সালে জেলার চৌহদ্দির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ৬৫টি গ্রাম ও দিনাজপুর জেলার ২৩৭টি গ্রামও এ জেলার মধ্যে আসে। ১৮৯৬ সালে খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংযুক্তিকরণের ঘটনা গঙ্গার চর ভূতনী দিয়ারার ৪০১ বর্গমাইল এলাকা।"[৪৯]

মালদা জেলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের (Division) অন্তর্গত হয়। ১৮৭২ - ১৮৭৬ এ রাজশাহী বিভাগে, ১৮৭৬ - ১৯০৫ সাল ভাগলপুর বিভাগে এবং ১৯০৫ সালে আবার রাজশাহী বিভাগে অর্ন্তভুক্ত হয়।

"প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সালের ১২ই আগষ্ট থেকে ১৭ই আগষ্ট মালদহের জনগণ জানতে পারেনি যে জেলাটির ভাগ্য কি! শেষ পর্যন্ত ১৭ই আগষ্ট বেতারে র‍্যাডক্লিফ কমিশনের (Radcliffe Award) ঘোষণা প্রচারিত হয়। এবং ঐ দিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে (Notification 67GA dated 17.08.47) পূর্বের মালদহ জেলার ১৫টি থানার মধ্যে দশটি থানা অর্থাৎ ১. ইংরেজবাজার; ২. মালদা; ৩. রতুয়া; ৪. হরিশ্চন্দ্রপুর; ৫. খরবা; ৬. গাজোল; ৭. হবিবপুর; ৮. বামনগোলা; ৯. মানিকচক; ১০. কালিয়াচক ভারতের এবং ৫টি থানা – শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয়। অর্থাৎ ১৭ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের এক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনেই এই জেলা ছিল। এবং ১৮ই মালদা জেলার শাসনভার ভূতপূর্ব পাবনার এ.ডি.এম. মঙ্গলকুমার আচার্যের হস্তে সমর্পিত হয়। তিনি ১৮ই আগষ্ট মালদা কালেক্টরেটের মাস্তুলে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলেন।"[৫০]

মালদা জেলায় ১টি মহকুমা (ইংরেজবাজার সদর) ছিল। দ্বিতীয় মহকুমা 'চাঁচল' ২০০১ সালের ১লা এপ্রিলে সৃষ্টি হয়। খরবা থানার পরিবর্তে হয়েছে চাঁচল থানা। পূর্বের ১০টি থানার সঙ্গে কালিয়াচক থানার একটি অংশ নিয়ে বৈষ্ণবনগর থানা (১৯৮৮ সালের ১৩ই মার্চ) সংযুক্ত হয়েছে। এ জেলায় বর্তমানে ১৫টি ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪৭টি ও গ্রাম সংসদ ২০১১টি রয়েছে।

২.৩ মালদহ জেলার নামকরণের ইতিবৃত্তঃ

মালদহ জেলার নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। মালদহ বা মালদা নামকরণ যে খুব প্রাচীন তার সমর্থন পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। 'খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিসের Molindia কে মালদা বলে উল্লেখও করা হয়ে থাকে। টলেমি যে kelynda বা কালীনদী বা কালিন্দীর (কালী নদী > কালিন্দী) যে অক্ষাংশ অর্থাৎ ২৫°৩০ বলে উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে মালদা (বর্তমানে পুরাতন মালদা) প্রায় মিলে যায়। কারন এ জেলার অক্ষাংশ ২৫°২ ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১১।'[৫১] ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে 'মালদহ' নামের উল্লেখ দেখা গেছে।[৫২]

প্রথমত, এই জেলায় সুদীর্ঘকাল থেকে 'মালো' জাতির বাস ছিল। এরা 'a Dravidian boating and fishing caste.'[৫৩] ফ্রান্সিস্ বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণ 'অতীতের মালদহ' গ্রন্থে পাই – "Of the malos, however, many are now settled here especially on the banks of the Ganges and Mahananda where there may be about 1600 families."[৫৪] এই 'মালো' জাতির নামানুসারেও এই জায়গার নাম 'মালদহ' হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলে একসময় 'মলদ' নামে এক কৌমগোষ্ঠী (Tribe) বসবাস করত। এদের বর্তমান প্রজাতি বিহারের রাজমহল পাহাড়ের কাছে বসবাস করেন। এদের বলা হয় মালপাহাড়ী। প্রায় দু'হাজার বছর আগে এই দ্রাবিড়ীয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে মালদায় 'মাল' বা 'মালপাহাড়িয়া'দের সংখ্যা ব্যাপক না হলেও তারা তাদের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে। ''অনুমান যে ঐ 'মলদ' শব্দ থেকেই মলদ > মালদ > মালদহ > মালদা > মৌলডা (ঐ শেষের দুটোই ইংরেজী স্টাইলের উচ্চারণে) ধারাপ্রবাহে এসে ঐ মালদহ শব্দটিকে সুগঠিত করেছে।[৫৫] তাই অনেকের মতে, 'মলদ' শব্দ থেকেই মালদা, মালদহ নামগুলি এসেছিল।

তৃতীয়ত, 'মালদহ' সংস্কৃত শব্দজাত নয়, আরবি। অতএব এই 'মালদহ' শব্দটি বঙ্গদেশে মুসলমানদের বিজয়ের পরে এসেছে। আরবি 'মাল' এবং বাংলা 'দহ' এই দুটি শব্দের মিলনে 'মালদহ' শব্দটির উৎপত্তি। 'মাল' শব্দের অর্থ সম্পদ আর দহ (হ্রদ > হদ > দহ – বর্ণ বিপর্যয়) শব্দের অর্থ সাগর। 'সম্পদের সাগর' এই রকম কিছু বোঝাতে এই শব্দের সৃষ্টি হতে পারে। একটি জনশ্রুতি আজও রয়েছে – জনৈক বিদেশী বনিকের লক্ষাধিক টাকার পারা পুরাতন মালদহ নিবাসী এক বৃদ্ধা কিনে নিয়ে পুকুরে ঢেলে দিতে বলেন। উল্লেখ্য, সেই 'পারা পুকুর' পুরাতন মালদহে ছিল। সুতরাং 'মাল' বা সম্পদের দিক দিয়ে এই নামকরণ সমর্থনযোগ্য।[৫৬]

চতুর্থত, ''সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ মাল (মল + ঘঞ্) শব্দের অর্থ উন্নত ক্ষেত্র বা উচ্চ জমি বোঝায়, তার সঙ্গে আঞ্চলিক 'দহ' যুক্ত হয়েই মালদহ হয়েছে। অবশ্য সে সম্ভাবনার কথা পূর্ণ সমর্থন করবে বর্তমানের ওল্ড মালদহ বা পুরাতন মালদহ সম্পর্কে যেহেতু সেটিই প্রাচীনতম মালদহ নামের জনপদ। ... এই পুরাতন মালদহ মহানন্দা ও কালিন্দ্রীর সংযোগস্থলে হওয়ায় এখানকার জলের ঘূর্ণি বা দহ থাকাই স্বাভাবিক।''[৫৭]

পঞ্চমত, 'মালদহের পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর জেলার এক খণ্ডিত অংশ) -এর গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর চাষিদের মুখে মাল জমি ও দহ জমি শব্দ দুটি প্রায়শই শোনা যায়। মাল জমি বলতে তারা উঁচু ও বহুফসলি জমিকে আর দহ বলতে জলকাদায় পরিপূর্ণ নীচু জলাজমিকে বোঝায়। মালদহ জেলার ভূ-প্রকৃতি এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। আর জেলা গঠনের পূর্বে মালদহ তো দিনাজপুর জেলারই একটি অংশ ছিল। তাই এই নামকরণটিকেও ভেবে দেখা যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেন ডঃ সুজয় ঘোষ।[৫৮]

৩. মালদহ জেলার জনবিন্যাস ঃ

৩.১ মালদহ জেলার জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ঃ

নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধান, নানা সংস্কৃতির ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সভ্যতা - সংস্কৃতির উল্লেখ্য দিক। অনুরূপভাবে মালদহ জেলাকেও আমরা তাই বলতে পারি। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের রাজধানী 'গৌড়' এর বুকে এবং তার সংলগ্ন জনপদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর এই এলাকায় সমাগম ঘটেছে।

পরিবর্তনশীল সমাজের জটিল সন্ধিক্ষণে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এককেটি অধ্যায়ে নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ভাষা-উপভাষা নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ মালদহে এসেছেন এবং প্রতিবেশী হয়ে শান্তিতে বসবাস করেছেন এবং করছেন। ইতিহাসের স্রোত ধারায় এই অঞ্চলে এসেছেন বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। পাল, সেন, কৈবর্ত, তুর্কি, পাঠান, হাবশি, মামুদশাহী, মোগল এবং আরও অন্যান্য বংশের তথা জাতির শাসনে বিবর্তিত হয়েছে মালদহ জেলা। পরবর্তীতে এসেছেন ডাচ্, ইংরেজ বণিকরা। পাশাপাশি মিথিলা, ভোজপুর এবং মগধ অঞ্চলেরও মানুষ এই অঞ্চলে এসেছেন। রাজমহল পাহাড় ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে শবর, ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া, শাউরিয়া পাহাড়িয়া সহ প্রচুর সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষজন এসে বসবাস শুরু করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রচুর মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনও এসেছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ এখানে এসেছেন এবং আসছেন। রেললাইন তৈরি হওয়ায় বিহার থেকেও কিছু মানুষ এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলার মানুষ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষও এসে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছেন। ফলস্বরূপ, এই জেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈচিত্র্য প্রচুর। তবে এখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এছাড়াও সামান্য কিছু পরিমানে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও বাস রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি উপশ্রেণি বা উপসম্প্রদায় রয়েছে। তবে এই বিভাগগুলি ধর্ম-উপাসনাগত এবং কর্ম বা পেশাগত কারণে।

W.W. Hunter 1872 খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বিবরণ দিয়েছেন। " ইংরেজ - ৬, আইরিশ - ১, স্কচ্ - ১২, ফরাসী - ২, ও সুইস - ২ জন, ইউরেশীয় - ১১ জন ছাড়া ভড়, ভূমিজ, ধাঙ্গর, খারোয়ার, কোল, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, বাগদী, বাহেলিয়া, বাউরী, বেদিয়া, ভুঁইয়া, বিন্দ, বুনা, চাঁই, চামার ও মুচি, চন্ডাল, ডোম, দোসাদ, গঙ্গোতা, হাড়ি, কাওরা, করঙ্গা, কোচ, পলি, রাজবংশী, মাহিলি, মাল, মালো, মরকন্ডে, মেথর, ভুঁইমালী, মুশাহর, পাসি, রাজওয়ার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঘাটওয়াল, কায়স্থ, ভাট, বৈদ, আগরওয়ালা, মাড়ওয়ারী, ক্ষত্রী, অসওয়াল, বাঙ্গাল, বানিয়া, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, গোয়ালা, গরেরি, গানরার, মোদক, কৈবর্ত, আগুরি, বারুই, তামলি, সদ্গোপ, মালি, কোয়েরি, কুর্মী, নাগর, ধোপা, হাজ্জাম, বেহারা এবং ডুলিয়া, কাহার, ধানুক, কামার, কাঁসারি, সোনার, সূত্রধর, কুমার, লাহেরি, শাঁখারি, শুঁড়ি, তেলি, কলু, তাঁতী, যোগী (যুগী), গনেশ, কপালি, ধনিয়া, বেলদার, চুনারী, নায়েক, নুনিয়া, পুন্ডারি, কান্ডারী, তুরহা, জালিয়া, মালা, মাছুয়া, তিয়র, পাটনী, পোদ, গণ্রি, বানফোঁর, বাথুয়া, কেউট, মুরিয়ারি, সুরাহিয়া, বাঁইতি, বৈষ্ণব, গোঁসাই, দেশি খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে জুলাহা (জোলা), মুঘল, পাঠান, সৈয়দ, সেখ নথিভুক্ত হয়েছে।" ৫৯

তবে জেলার কোন্ দিকে কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ বাসকরে তার বিবরণ পাই — "জেলার পূর্ব দিকে হবিবপুর, বামনগোলায় যেমন রাজবংশী, দেশী পোলিয়া, সাঁওতাল, উরাম, লোহার, পুন্ড্রক্ষত্রিয় এবং উত্তর - পশ্চিম দিকে চাঁই মন্ডল, নাগর মন্ডল, বিন্দ, কাহার, দোযাদ, মৈথিল, রাজপুত-ক্ষত্রিয়, চাযোট বাঙালী এবং তাম্বলী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসতি আছে, জেলার উত্তর দিকে তেমনি কেওট, ভুঁইমালী, রওয়ানা, মাহারা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসতি লক্ষ্য করা যায়। জেলার দক্ষিণ দিকেও তেমনি লক্ষিত হয় শেরশাহীবাদিয়া, রায় ঘাটোয়াল, মালপাহাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নিবিড় বসতি।" ৬০

বর্তমানে মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলি এইরূপ —

ক) হিন্দু ঃ

- সাঁওতাল ঃ এরা অনার্য। 'ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী অস্ট্রো - এশিয়াটিক কোল বা খেরওয়াল গোষ্ঠীর প্রধান শাখা।'[৬১] 'ধর্মের দিক দিয়ে এরা চারটি ভাগে বিভক্ত ঃ খ্রীষ্টান, হিন্দু, খেরোয়ার এবং সাঁওতাল।' [৬২] অধিকাংশ সাঁওতালরা কৃষিজীবী। আবার কিছু কিছু সাঁওতাল প্রায়ই তীর ধনুক ও কুকুর সঙ্গে নিয়ে ইঁদুর, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি শিকার করে। নীলকুঠির সাহেবরা নীল তৈরির কারখানাতে শ্রমিকের কাজ করানোর জন্য বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে প্রচুর সাঁওতাল এনেছিল। আবার ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ সরকারের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একদল বিদ্রোহী সাঁওতাল এ জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে। গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর থানার অসংখ্য গ্রামে এদের বাস।

- **মালপাহাড়ি, মালপাহাড়িয়া** ঃ এরা কোল গোষ্ঠী কিংবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বলে কেউ কেউ মনে করেন। 'বীরভূম জেলার রামগড় পর্বতবাসী এবং সাঁওতাল পরগণা তথা রাজমহল পবর্তের পাদদেশের জাতি বিশেষ।'[৬৩] এরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু'র মধ্যে গণ্য। এদের জীবিকা - মৃগয়া। আবার চাষও করে। এরা ইংরেজবাজারের আজিমপুর, গোপালপুর, সুলতানপুর, নাজিরখানি, কিষানপুর, রামকেলী, সাগরদীঘি, পুরতন মালদার ঝাঁঝরা, কাটাবাড়ী, মশালডাঙা, গোয়ালপাড়া এবং গাজোলের বকদীঘি, ভালুক ডাঙা, আলমপুর, রাণীপুর, ফতেপুর, খাকসোল ইত্যাদি অঞ্চলে অধিক বাস।

- মাহালি, মহালি ঃ এরা অস্ট্রিক-ভাষী আদিবাসী।[৬৪] এরা ঝাড়খন্ড থেকে এখানে আসে। এরা মজুর শ্রেণির, পাল্কী বাহক এবং বাঁশ ও বেতের কাজ করে। এরা পুরাতন মালদার শিমূল ঢাব, জহুরী, গাজোল ব্লকের আলমপুর, একান্দর ও চিরাকুটি ইত্যাদি গ্রামে অধিক সংখ্যায় বসবাস করে।

- মালে মাল ঃ 'এরা রাজমহল পর্বতের দ্রাবিড়ীয় কৃষক বংশ থেকে উদ্ভুত। সম্ভবত এরা ওঁরা ওদের সমগোত্রীয় এবং বৃহৎ বিক্ষিপ্তভাবে শবর জাতিরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা।'[৬৫] পূর্বে ঝাড়খন্ডের রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের খুটা ইত্যাদি পাহাড় থেকে গঙ্গা পেরিয়ে এখানে আসে। এরা চৌকীদারের পদেই বেশী কাজ করেছে। এদের মধ্যে ডাইনী প্রথা প্রচলিত। পুরাতন মালদা, কোতয়ালী অঞ্চলে বেশি বাস করে। এদের পেশা – চাষবাস, মজদুরি, ধানকাটা, ধান মাড়াই, ধান লাগানো, ধান সেদ্ধ করা ইত্যাদি।

- কোরা, কোড়া, খইরা, খয়রা ঃ ছোটনাগপুর এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী মুন্ডা জাতিরই এক শাখা। এরা কৃষিজীবী। এদের মধ্যে ডাইনী প্রথা, ভূতে পাওয়া, হাওয়া ধরা ইত্যাদি কুসংস্কারগুলি আজও দেখা যায়। বাদনা পরবের সময় একবার ধনুক, বল্লম, বাঁটুল ইত্যাদি নিয়ে শিকারে যায় এবং ইঁদুর, পাখি ইত্যাদি শিকার করে সবাই এক জায়গায় মিলিত হয়ে রান্না করে খায়। এই জেলার গাজোল, হবিবপুর এবং পুরাতন মালদা ব্লকে এদের অধিক বাস।

- **খারোয়ার, খারবার, খেরওয়ার** ঃ এরা ছোট নাগপুর ও দক্ষিণ বিহারের কৃষিজীবী। এদের সাঁওতালদের মতো আকৃতি সাদৃশ্য আছে। বর্তমানে এই জেলার রতুয়া, মানিকচক, চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর, গাজোল ব্লকে অধিক পরিমানে বাস করে।

- কোচ, রাজবংশী ঃ কোচ উত্তর-পূর্ব ও পূর্ববঙ্গের কিঞ্চিত মঙ্গোলীয় রক্ত মিশ্রণে এক দ্রাবিড়ীয় উপজাতি।[৬৬] কোচরা এখন আর নিজেদের কোচ না বলে কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদায় রাজবংশী বলে

পরিচয় দেয়।[৬৭] এই জেলার বামনগোলা, হবিবপুর, গাজোল, পুরাতন মালদা, কালিয়াচক থানায় অধিক সংখ্যক বাস করে। কোচ - রাজবংশীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব ও শৈব।

- **পলি, পলিয়া ঃ** রাজবংশী সম্প্রদায়েরই অর্ন্তভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ণ করে বলে এদের 'পলিয়া বলা হয়। অবশ্য বুকানন মনে করেন যে এক কালে যারা দিনাজপুর ও রংপুরে পাণিকোচ নামে পরিচিত ছিল, তারাই 'পলিয়া' নামে পরিচিতি।[৬৮] বামনগোলা, হবিবপুর এবং গাজোল থানায় অধিক সংখ্যক বাস করে। এরা মূলত কৃষিকাজ করে। তবে ইদানিং অন্য কাজও করে।

- **বিন, বিন্দ, বিন্দু ঃ** এরা অন-আর্য জাতি বিশেষ।[৬৯] এ জেলার বিন / বিন্দরা বিহার এবং বাংলাদেশ থেকে দেশ বিভাগের আগেই আসে। এরা মানিকচক, রতুয়া, কালিয়াচক, পুরাতন মালদা, এবং ইংরেজবাজার থানায় বসবাস করেন। এরা মৎসজীবী, কৃষিজীবী, শিকারী এবং মাটি কাটার কাজও করে।

- **তিয়র, তিয়ার ঃ** 'রিজলি তিয়রদের বাংলা ও বিহারের দ্রাবিড়ীয়, নৌকো চালনায় যুক্ত শ্রমজীবী এবং মৎসজীবী সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।'[৭০] মালদা জেলায় এদের প্রধান পেশা চাষ-বাস। এই জেলার ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক, চাঁচল থানার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করে।

- **ভুঁইমালী, ভুসুন্দর ঃ** পূর্ব বাংলায় কৃষিজীবী, পাল্কীবাহক - শ্রমজীবী হলেও মালদা জেলায় এরা বাঁশ দিয়ে চাঙারী, কুলা ইত্যাদি তৈরি করে। বর্তমানে কৃষিকাজেই বেশী লিপ্ত। এই জেলার পুরাতন মালদা, গাজোল, বামনগোলা এবং হবিবপুর থানায় বসবাস করে।

- **মুসাহার, মুসাহর ঃ** এরা বাংলার আদিম জাতি। 'ভাষাগতভাবে তাদের কোল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর[৭১] অর্ন্তভুক্ত করা যায়, তবে নেসফিল্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুসাহরদের সঙ্গে দ্রাবিড়, শবর ও চেরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।'[৭২] মালদা জেলার চাঁচল, রতুয়া, মানিকচক, ইংরেজবাজার ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে বাস করে। রিজলি তাদের মূষিক আহারকারী বা মুষিক শিকারী বলেই মনে করেন।

- **চাঁই, চাই ঃ** এরা প্রাচীন আর্যেতর সম্প্রদায় এবং বিশেষ উপজাতির বংশধর। "Chain, Chai, Bara, Chain a cultivating and fishing caste of Behar and Central Bengal, Probably an offshoot from some non- Aryan tribe." [৭৩] এরা বিহার থেকে আসে। কৃষিকাজ এবং মাছ ধরা এদের কাজ। নারী-পুরুষ – উভয়েই ক্ষেত খামারে কাজ করে। নদীর ধারেই বেশী বাস করে।

- **নাগর ঃ** এরা ছোট নাগপুর থেকে এসে মালদায় বসতি স্থাপন করে।[৭৪] 'নগর' থেকে নাগর শব্দ কিংবা 'নাগ' থেকে নাগর শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। এরা কৃষিজীবী। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, মানিকচক ব্লকেই এদের সংখ্যা বেশী। তবে অন্য ব্লকেও কিছু কিছু রয়েছে।

- **কৈবর্ত, কেউট ঃ** এরা বিহার রাজ্য থেকে এসেছে। "কৈবর্তরা কোনও আর্যপূর্ব কৌম বা গোষ্ঠী ছিল এবং তাহারা ক্রমে আর্য- সমাজের নিম্ন স্তরে স্থানলাভ করিতেছিল।"[৭৫] এরা মৎসজীবী। মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে বলে এদের 'মাছুয়া' বলে। এরা নদীর কিংবা জলাশয়ের ধারে বাস করে। কিছু কিছু কেওটরা মাছ ধরা বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকাজও করে। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া ইত্যাদি ব্লকে বহু সংখ্যায় এরা বাস করে।

LIBRARY NBU DARJEELING
271069
07 JUN 2014

- **ধানুক** ঃ মূলতঃ অনার্য গোষ্ঠীরই একটি শাখা। এরা গৃহস্থ বাড়ীতে পরিচারক হিসাবে কাজ করত। বর্তমানে কৃষিকাজও করে। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, হবিবপুর, রতুয়া ও মানিকচক ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে বাস করে।

- **মালো, ঝালো -মালো** ঃ 'বাংলার এক দ্রাবিড়ীয় নৌকা বাহক ও মৎসজীবী সম্প্রদায়'।[৭৬] মাছ ধরা ও বিক্রি করা এদের পেশা। মানিকচক, রতুয়া, ইংরেজবাজার ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এদের বসতি।

- **চামার, মুচি, চর্মকার** ঃ এরা মৃত পশুর চামড়া ও চামড়াজাত বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। এরা মুচি, ঋষি রবিদাস ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এরা উৎসব-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্রও বাজায়। চাষবাসও করে। ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক, পুরাতন মালদা, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, হবিবপুর ইত্যাদি ব্লকেই বাস করে।

- **ডোম** ঃ আগে মূলতঃ শব সৎকার ও বাঁশের কাজ করলেও এখন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। এই জেলাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এদের পদবী ভগত / ভকত। এরা শূকর বেশী পালন করে। জেলার সর্বত্রই কিছু কিছু এদের বাস লক্ষ্যনীয়।

- **নমশূদ্র** ঃ এই জেলার বামনগোলা, গাজোল, হবিবপুর ব্লকেই বেশী সংখ্যায় বাস করে। মূলতঃ দ্রাবিড়ীয় কুলজাত এই সম্প্রদায় বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত।

- **কামার, র্কমকার** ঃ এরা লোহার বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। লাঙল, ফাল, কাস্তে, কাটারি ইত্যাদি তৈরি করে এবং এরা বিভিন্ন মেলাতে দোকান খুলে বিক্রিও করে। জেলার সর্বত্র এদের বাস তবে সংখ্যায় খুব কম।

- **কুম্ভকার, কুমার** ঃ এরা মূলতঃ মাটির বিভিন্ন রকম পাত্র তৈরি করে। মানিকচক, কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা ইত্যাদি ব্লকেই এদের বাস। এদের পদবী পাল। বিভিন্ন পেশায় যুক্ত।

- **সোনার, স্বর্ণকার** ঃ এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সোনার ও রূপার অলংকার তৈরী শিল্পের সাথে যুক্ত। জেলার প্রায় সর্বত্রই খুব কম সংখ্যায় এদের বাস দেখা যায়।

- **ধোপা, রজক** ঃ এরা কাপড় কাচার কাজ করে। এরা কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রীও করে দেয়। জেলার বিভিন্ন জায়গায় খুব কম সংখ্যায় এদের দেখা যায়। তবে বর্তমানে নানা পেশায় যুক্ত।

- **নাপিত** ঃ এরা প্রধানতঃ ক্ষৌর কর্মের সাথে যুক্ত। বিভিন্ন জায়গায় এরা সেলুন খুলেও ব্যবসা চালায়। এদের পদবী প্রামাণিক, শীল, বারিক ইত্যাদি। বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। উল্লেখ্য, এই জেলায় বিহারেরও কিছু নাপিত রয়েছে। এদের ভাষা ভোজপুরী। উপাধি ঠাকুর। এরা আবার পৈতাধারী।

- **গোপ, গোয়ালা** ঃ এরা গরু-মহিষ পালন করে। দুধ, দই বিক্রি করে। কৃষিকাজও করে। কালিয়াচক, পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার, মানিকচক ইত্যাদি ব্লকে এদের সংখ্যা বেশি। এদের পদবী ঘোষ।

- **যুগী, যোগী** ঃ এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইংরেজবাজার, মানিকচক ও চাঁচল ব্লকে বাস করে। এরা একটি বিশেষ ধর্মীয় উপাসনাগত সম্প্রদায়। এরা বিভিন্ন জায়গায় যুগী / যোগীর গান পরিবেশন করে।

- **ময়রা, মোদক** ঃ এরা প্রধানত মিষ্টান্ন তৈরি ও ব্যবসায় যুক্ত। এদের অনেক গোত্র ও পদবী রয়েছে। তবে সাহা পদবী বেশী লক্ষ্যণীয়। খুব অল্প সংখ্যায় জেলার সর্বত্র দেখা যায়। বিভিন্ন পেশাতেও নিযুক্ত।

● তেলি ঃ এরা সরিষা, নিম, তিল, তিসি ইত্যাদি বীজ থেকে তৈল তৈরি করে। তবে কলুর ব্যবহার কমেছে। গ্রামে ঘুরে ঘুরেও তেল বিক্রি করে। বিভিন্ন পেশায় বর্তমানে নিযুক্ত। এদের সংখ্যাও খুব কম।

● ব্রাহ্মণ ঃ যাগ-যজ্ঞ ও পুরোহিতের কাজ করে। এরা শিক্ষিত এবং ধনবান। এই জেলায় বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ দেখা যায় — বাঙালি ব্রাহ্মণ — চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী ইত্যাদি পদবী বিশিষ্ট। মৈথিলী ব্রাহ্মণ — ঝা, ওঝা, মিশ্র, উপাধ্যায়, কুমার ইত্যাদি পদবী বিশিষ্ট। উত্তরপ্রদেশ / বিহার বা অন্য প্রদেশ থেকে আগত — দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, পান্ডে, তিওয়ারী ইত্যাদি পদবী বিশিষ্ট। এরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। মানিকচক, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, পুরাতন মালদহ, রতুয়া ইত্যাদি থানাতেই এদের বাস।

● কায়স্থ ঃ জেলার প্রায় প্রতিটি থানায় এদের বাস। এদের মধ্যেও শিক্ষা-দীক্ষা বেশ ভাল। এদের পদবী - দে, দাস, সরকার, মজুমদার ইত্যাদি। বর্তমানে কৃষিকাজ সহ বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত।

● পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় ঃ এই অঞ্চলেরই প্রাচীন জাতি। আঞ্চলিক নাম পোদ বা পুড়া জাতি। এরাই সম্ভবতঃ আখ চাষ ও গুড় তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। এরা কৃষিকাজেও নিপুণ। এই জেলার পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার, হবিবপুর ও কালিয়াচক ব্লকে এরা বেশী বাস করে। বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত।

এছাড়াও এই জেলায় হিন্দুদের মধ্যে মালাকার, নুনিয়া, গঙ্গোতা, কিষান, দোসাদ, ঢুলি, গনেশ, বাগদি, কাহার, পুলিন্দ, লোধা, ভূমিজ, পাটনি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

খ) মুসলমান ঃ ২০০১ সালের জনগণনায় এই জেলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়। এই জেলায় বসবাসকারী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পরিচয় দেওয়া হল —

● বাদিয়া, শেরশা বাদিয়া ঃ এরা বাংলাভাষা-ভাষী মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ। 'শেরশাবাদিয়া' বা 'বাদিয়া' নামটি শেরশাহবাদ পরগণা থেকে নিরুক্ত হয়েছে।[৭৭] 'কারও মতে, এঁরা ধর্মান্তরিত রাজবংশী মুসলমান। আবার কেউ মনে করেন এঁরা মূলত মারাঠি জাতি, যাঁরা মারাঠি সৈন্যদের সঙ্গে বাংলা দেশে এসেছিলেন।'[৭৮] এরা 'পাঞ্জাব থেকেই শেরশাহের সঙ্গে গৌড় বাংলায় পর্দাপণ করেন।[৭৯] এরা জন্মসূত্রেই প্রচন্ড পরিশ্রমী। গাজোল, কালিয়াচক, মানিকচক এবং রতুয়া থানায় অধিক বাস। এদের ভাষাকে 'বাদিয়া - ভাষা' বলে। তবে আরেকটি কথা উল্লেখ্য - "পূর্বপুরুষদের সেনানী বৃত্তিটা আজ হারিয়ে ফেললেও উদ্ধত সেনানী প্রকৃতির মেজাজ তথা এক গুঁয়েমি মনোভাব প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যর জন্যই স্থানীয় ভাষায় এদের 'হ্যান্টিয়্যা' বা 'হ্যান্টা' বাদিয়া বলা হয়। [৮০]

● শেখ ঃ এরা অভিজাত মুসলমান, তবে এই জেলায় শেখ নামে মুসলমানদের বিশেষ সম্প্রদায়কে সনাক্ত করা কষ্টকর। শেখ উপাধির ব্যবহার অনেকেই করেন। সমগ্র জেলাতে এদের বাস লক্ষ্যণীয়।

● পাঠান ঃ এই সম্প্রদায়ের মানুষও এই জেলায় বসবাস করেন। এরা সাধারণতঃ খান, খাঁ, মল্লিক ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করেন।

● সৈয়দ ঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি উপসম্প্রদায় বিশেষ। এরা পয়গম্বরের বংশধর হওয়ার জন্য বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ নিজেকে সৈয়দ বংশোদ্ভুত বলে দাবি করতেন।

- **আফগান** ঃ তুর্কিদের সাথে এখানে আসেন। তারপর কিছু সংখ্যক স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এদের সংখ্যাও এ জেলায় কম নেই।

- **মোমিন / জোলা** ঃ এরা বহিরাগত। এদের আবার জোলাও বলা হয়। তাঁতের কাজ এদের আদি পেশা। কালিয়াচক, ইংরেজাজার থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এদের বসবাস। কেউ কেউ মনসা পূজাও করে।

- **পাঁঝরা** ঃ এরা ধর্মান্তিরিত মুসলমান। এরা মাছের ব্যবসা করে। 'এদের মেয়েদের মধ্যে সিঁদুর পরার চল আছে।'[৮১]

- **পেঁচি** ঃ বাদিয়া সম্প্রদায়েরই একটি ভাগ বিশেষ। 'শুধু ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে সামান্য একটু পার্থক্য আছে।'[৮২]

- আরবীয় ঃ আরবের কিছু মানুষ সুফি ধর্ম প্রচারক ও বণিক হিসেবে এ জেলায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এদের আচার আচরণ এখন বাংলার মুসলমানদের মতোই হয়ে গেছে।

- নাদাব বা ধুনিয়া ঃ এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা তুলা ধুনার কাজ করে। লেপ, বালিশ ইত্যাদি বানায়। এদের সংখ্যাও মালদা জেলায় কম নয়।

- নাড়ে গুস্তি ঃ এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা আগে নাকি নদীয়া জেলায় বাস করতো। তারা হিন্দু ছিল। বহু শতাব্দী পূর্বে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারপর নদীয়া ত্যাগ করে রাজশাহী জেলার নাটোর অঞ্চলে যায়। কিন্তু তাদের বসতি গড়ার মতো প্রচুর জমি ছিল না। তাই তারা গৌড় এবং পাডুয়া অভিমুখে যাত্রা করে এবং এ জেলার মহানন্দা নদীর পশ্চিম অংশে বসতি গড়ে তোলে। 'উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদের মালদা জেলায় অনুপ্রবেশ ঘটে ছিল বলে ধরা হয়। যদিও এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তবুও এখনও এদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দু রীতিনীতি প্রচলিত আছে। যেমন এরা উৎসবে এবং পূজা পার্বণে আলপনার ব্যবহার করে। প্রতি বৈশাখ মাসে এরা বুড়িমা নামে এক দেবীকে পুজো দেয়।'[৮৩]

- কুঁঝড়া ঃ এরাও পাঁঝরাদের মতো মাছের ব্যবসা করে। কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, গাজোল, প্রভৃতি থানায় এদের বাস।

- দ্বারভঙ্গিয়া ঃ এরা বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে আগত। এরা দীর্ঘদেহী। এদের ভাষার সঙ্গে দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। এরা কৃজিকাজ করে। এরা দীর্ঘদেহী তাই অনেকে সামরিক বিভাগে চাকরি করে থাকে।

- হোসেনী ঘোষ / গোয়ালা ঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের এই গোষ্ঠীর মানুষজন এই জেলায় বসবাস করেন। এদের বিবাহিত মহিলারাও সিঁদুর পরে। জনশ্রুতি রয়েছে – সুলতান হোসেন শাহের জন্য দুধ যোগানোর কাজ সচল রাখার কারণেই এরা ধর্মান্তরিত হয়েছে। মতান্তরে এদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। 'এদের জীবন যাপনে হিন্দু ও মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।'[৮৪]

- **খোন্দকার / খন্দকার** ঃ সম্ভ্রান্ত মুসলমান। এরা কৃষিকাজ করে।

- **আরজল** ঃ নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান।

- হাজ্জাম ঃ এরা সাধারণত সুন্নত বা খত্‌নার কাজ করে। এই ধরনের কিছু পরিবার জেলা জুড়ে রয়েছে।

- **পামারিয়া** ঃ এই সম্প্রদায়ের মুসলমানরা আগে কোন বাড়িতে নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করলে ঢোল বাজিয়ে গান করে জীবিকা নির্বাহ করত। হিন্দুদের বাড়িতে যেত। রামায়ণের গানও শোনাত। 'আলো পোমগরিয়া / দে লোটা থগড়িয়া'

বলে গান শুরু করত। এরা কিন্তু হিজড়া নয়। মানিকচক, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ইত্যাদি থানায় খুব অল্প সংখ্যায় এদের দেখা যায়। ধীরে ধীরে পূর্বপুরুষের বৃত্তি ছেড়ে বর্তমানে বিভিন্ন রকমের ব্যবসা বাণিজ্য করে।

- ফকির / সাঁই ঃ এই সম্প্রদায়ের মুসলমানরা সুফি মতাবলম্বী। এদেরকে ফকিরও বলা হয়। এরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষাও করে। প্রায় বিভিন্ন থানাতে এদের বাস। তবে চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে বেশী রয়েছে।

- ওস্তাগর / দর্জি ঃ এই সম্প্রদায়ের মুসলমানরা মূলতঃ দর্জির কাজ করে। কুর্তা, কামিজ, প্যান্ট ইত্যাদি সেলাই করে।

- নৈস্য শেখ ঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি উপসম্প্রদায় বিশেষ। এরা ধর্মান্তরিত মুসলমান। অনেকে অনুমান করেন – রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিছু হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। আবার কারো মতে- তাদের জাতি নষ্ট হয়ে শেখ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল বলে নষ্ট শেখ থেকে নৈস্য শেখ নামকরণ হয়েছে।

- সুফী ঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা উদার পন্থী। এ জেলাতেও এদের বাস রয়েছে।

- পটুয়া ঃ এই সম্প্রদায়ের মুসলমানরা শিল্পকর্মে নিযুক্ত। এরা চিত্র শিল্পী বা পট শিল্পী। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে জীবিকা নিবাহ করে।

- চামকাটি মুসলমান ঃ বিলুপ্তপ্রায় এই উপসম্প্রদায় পুরাতন মালদহের চালসাপাড়া ও অন্যত্র রয়েছেন। এরা গৌড়স্থিত চামকাটি মসজিদে নামাজ পড়ত। আবার কারো মতে, এরা নিজের দেহের চামড়া কেটে আল্লাহকে উৎসর্গ করে তাঁর কৃপালাভের চেষ্টা করত বলে, এই রকম নামকরণ হয়েছে।

- উপরাটিয়া ঃ এরা শেখ সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। এরা সাধারণতঃ রেশম চাষ ও পলু পালন সুদীর্ঘকাল থেকে করে আসে। এই জেলায় বিশেষতঃ কালিয়াচক থানায় বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছেন।

- পিঠারি ঃ এরা পিঠা এবং রুটি তৈরীর কাজ করেন। বিভিন্ন পেশাতেও নিযুক্ত।

- তিরকর ঃ এরা দীর্ঘদিন ধরে তীর বা শর তৈরী করত। বর্তমানে বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত।

- গরসাল ঃ এরা ধর্মান্তরিত মুসলমান। ভিক্ষাবৃত্তি করেই জীবিকা নির্বাহ করে।

- মুকেরি ঃ এরা গবাদি পশু পালন করে। গবাদি পশু কেনা ও বেচা উভয়ই করে থাকে। এছাড়াও এ জেলায় – কাবাড়ি, সানাকর, কাগজা, হাজাম বা ললুয়া, মুয়োজ্জিন (মসজিদের মিনার থেকে উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম ঘোষণা করে বা আজান দেয়), চুড়িওয়ালা, তাসাওয়ালা ইত্যাদি শ্রেণির মুসলমান বাস করেন।

গ) খৃস্টান ঃ এই জেলায় ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট এই দুটি শ্রেণিরই কিছু খৃষ্টান বাস করেন। তবে এরা সম্পূর্ণ ধর্মান্তরিত খৃষ্টান। এরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। তবে আদিবাসী ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়েরও ধর্মান্তরিত খৃষ্টান কিছু রয়েছে। পুরাতন মালদহ, মালদহ, হবিবপুর, গাজোল ও বামনগোলা থানায় এদের সংখ্যা বেশি।

ঘ) শিখ ঃ কিছু শিখ সম্প্রদায়েরও মানুষ এই জেলায় বাস করেন। স্বয়ং গুরুনানক একবার পুরাতন মালদহে এসেছিলেন। পুরাতন মালদহ ও ইংরেজ বাজারেই এদের সংখ্যা বেশী।

ঙ) জৈন ঃ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু পরিবার মালদা জেলায় বাস করেন। জৈনদের মধ্যে মূলতঃ মাড়োয়ারীদের লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে দেখা যায়। মূলতঃ এরা বড় ব্যবসায়িক।

চ) বৌদ্ধ ঃ অতীতে এই জেলায় বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য ছিল, বর্তমানে নেই। খুব কম সংখ্যায় বৌদ্ধদের দেখা যায়।

ছ) অন্যান্য ঃ উপরোক্ত সম্প্রদায় ছাড়াও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ চাকুরী ও ব্যবসার জন্য এ জেলায় বাস করেন। তারা এ জেলার বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন।

৩২. জন সংখ্যা ও জনবসতি ঃ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। এদেশ থেকে বহু মুসলমান বাংলাদেশে এবং অনেক হিন্দু বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে আসেন। এই যাওয়া-আসা মালদা জেলাতেও ঘটেছে। বর্তমানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে বহু মানুষের অনুপ্রবেশ এ জেলায় ঘটছে। আর এখানে এলেই স্থায়ীভাবে থাকার বন্দোবস্ত করেই নেয়। ২০০১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৩২,৯০,৪৬৮ জন। এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ১৬,২১,৪৬৮ জন, মুসলমান ১৬,৩৬,১৭১ জন, খৃষ্টান ৬,৩৮৮ জন, শিখ ২৮৩ জন, বৌদ্ধ ১৬৪ জন, জৈন ২৯৩ জন এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ২২,৩৫০ জন। এছাড়া ধর্মের উল্লেখ নেই এরূপ জনগণের সংখ্যা ১৩৫১ জন। ১৯৫১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনগণনার সংখ্যা দেখলে আমরা বলতেই পারি— এই জেলায় জনবিস্ফোরণ ঘটেছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী হিন্দু ধর্মের মানুষের মধ্যে যতটা লক্ষ্যনীয়, মুসলমান ধর্মের মধ্যে কিন্তু ততটা নেই। তবে ইদানিং মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন বিষয়ে সজাগতা বাড়ছে। এই জেলার জনসংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আমরা ছক দেখলেই বুঝতে পারব —[৮৫]

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯৫১	৯,৩৭,৫৮০ জন
১৯৬১	১২,২১,৯২৩ জন
১৯৭১	১৬,১২,৬৫৭ জন
১৯৮১	২০,৩১,৮৭১ জন
১৯৯১	২৬,৩৭,০৩২ জন
২০০১	৩২,৯০,৪৬৮ জন

এই জেলায় ১৯৫১ সালে ৯,৩৭,৫৮০ জন জনসংখ্যা ছিল আর ৫০ বছরে তা লাফিয়ে হয়ে গেল ৩২,৯০,৪৬৮ জন। এই জনবিস্ফোরণের কারণ প্রধানতঃ অনুপ্রবেশ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সম্পর্কে অনীহা বা উদাসীনতা; ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতি। ২০০১ সালের জনগনণা অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা৩২,৯০,৪৬৮ জন। এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ১৬,২১,৪৬৮ জন, মুসলমান ধর্মাবলম্বীর জনসংখ্যা ১৬,৩৬,১৭১ জন। খৃষ্টানদের জনসংখ্যা ৬,৩৮৮ জন, শিখদের জনসংখ্যা ২৮৩ জন, বৌদ্ধদের জনসংখ্যা ১৬৪ জন, জৈনদের জনসংখ্যা ২৯৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ২২,৩৫০ জন। এছাড়া ধর্মের উল্লেখ নেই এমন মানুষের সংখ্যা ১,৩৫১ জন।

২০০১ সালে আদনসুমারি অনুযায়ী ১৫টি ব্লকের জনবসতির সংখ্যা —

হরিশ্চন্দ্রপুর - ১ নং ব্লকে	১,৬২,৪০৬ জন
হরিশ্চন্দ্রপুর - ২ নং ব্লকে	১,৯৮,০৩৯ জন
চাঁচোল - ১ নং ব্লকে	১,৭৪,২০৪ জন
চাঁচোল - ২ নং ব্লকে	১,৬৫,১৯২ জন
রতুয়া - ১ নং ব্লকে	২,১৭,৩৫৬ জন
রতুয়া - ২ নং ব্লকে	১,৬০,৯০৪ জন
গাজোল ব্লকে	২,৯৪,৭১৫ জন
বামনগোলা ব্লকে	১,২৭,২৫২ জন
হবিবপুর ব্লকে	১,৮৭,৬৫০ জন
পুরাতন মালদা ব্লকে	১,৩১,২৫৫ জন
ইংরেজবাজার ব্লকে	২,২৬,২৩৬ জন
মানিকচক ব্লকে	২,১৪,১২৭ জন
কালিয়াচক - ১ নং ব্লকে	৩,১০,৯৩৫ জন
কালিয়াচক - ২ নং ব্লকে	২,১১,৪০৬ জন
কালিয়াচক - ৩ নং ব্লকে	২,৫৮,৩৭৬ জন
ইংরেজবাজার পৌরসভায়	১,৬১,৪৫৬ জন
পুরাতন মালদহ পৌরসভা	৬২,৯৫৬ জন

জনঘনত্বের বিচারে সর্বাধিক লোক বাস করেন ইংরেজবাজার পৌরসভায়, প্রতি বর্গ কি.মি.তে ১১,৮৪৬ জন। আর ব্লক গুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনঘনত্ব কালিয়াচক - ১ নং ব্লকে প্রতি বর্গ কি.মি.তে ২,৯৫১ জন। আর সবচেয়ে কম জনঘনত্ব হবিবপুর ব্লকে সেখানে প্রতি বর্গ কি.মিতে ৪৭৪ জন মাত্র। ২০০১ সালের জন গণনা অনুসারে মালদহ জেলার জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.তে ৮৮১ জন।

৩.৩ নারী ও পুরুষ ঃ

২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী মালদা জেলার মোট জন সংখ্যার ১৬,৮৯,৪০৬ জন পুরুষ এবং ১৬,০১,০৬২ জন নারী। মোট জনসংখ্যার ৪৮.৬৫% নারী অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৫।

স্বাধীনোত্তর মালদহ জেলার নারী-পুরুষের জনসংখ্যা নিম্নরূপ [৮৬] —

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	প্রতি ১০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা
১৯৫১	৯,৩৭,৫৮০	৪,৭৬,৭৯৪	৪,৬০,৭৮৬	৯৭
১৯৬১	১২,২১,৯২৩	৬,২১,৯৯০	৫,৯৯,৯৩৩	৯৬
১৯৭১	১৬,১২,৬৫৭	৮,২৭,৭০৬	৭,৮৪,৯৫১	৯৫
১৯৮১	২০,৩১,৮৭১	১০,৪২,৪৯৮	৯,৮৯,৩৭৩	৯৫
১৯৯১	২৬,৩৭,০৩২	১৩,৬০,৫৪১	১২,৭৬,৪৯১	৯৪
২০০১	৩২,৯০,৪৬৮	১৬,৮০,৪০৬	১৬,০১,০৬২	৯৫

৩.৪ তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি ঃ

এই জেলায় তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি এবং উপজাতির বসবাস ভালই রয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা প্রথম দিকে খুবই কম ছিল। পৈতৃক পেশাকে তারা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। যুগ পাল্টেছে। তারাও শিক্ষা-দীক্ষার আলোতে পথ চলতে বাধ্য হয়েছে। পড়াশুনা করে কিছু কিছু চাকরিও তারা পাচ্ছে। বেশীর ভাগ তফশিলীরা Bilingual বা দ্বিভাষা-ভাষী।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই জেলায় মোট ৫,৫৪,১৬৫ জন তফশিলী জাতি এবং ২,২৭,০৪৭ জন তফশিলী উপজাতির মানুষ বাস করেন। ব্লক এবং পৌরসভা ওয়ারী এই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা নিম্নরূপ[৭] —

ব্লক	তফশিলী জাতি			তফশিলী উপজাতি		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
হরিশ্চন্দ্রপুর - ১	২০,৯২১	১৯,৮৮৫	৪০,৮০৬	১,৭৫৯	১,৭২৪	৩,৪৮৩
হরিন্দ্রন্দ্রপুর - ২	১১,৪৮০	১০,৬৪৬	২২,১২৬	২,৭৩৩	২,৬৫১	৫,৩৮৪
চাঁচল - ১	১২,০৭৬	১১,৬৬০	২৩,৭৩৬	৩৪৮	৩৩৬	৬৮৪
চাঁচল - ২	৭,২৭৫	৭,২৪৩	১৪,৫১৮	৫,৯৩৩	৫,৮৬৫	১১,৭৯৮
রতুয়া - ১	৯,১০৯	৮,৫৩৭	১৭,৬৪৬	৮,২৮৬	৭,৮৫২	১৬,১৩৮
রতুয়া - ২	৬,৫৩১	৬,২৮১	১২,৮১২	৭৯৭	৮১০	১,৬০৭
গাজোল	৫০,৬৮৩	৪৭,৯৬৬	৯৮,৬৪৯	২৮,৭৯৩	২৯,২৮৩	৫০,০৭৬
বামনগোলা	৩২,৮১০	৩০,৬৪৯	৬৩,৪৫৯	১২,৪৮৫	১২,৫৯৮	২৫,০৮৩
হবিবপুর	৪৪,২৩১	৪২,৬৩৪	৮৬,৮৬৫	২৭,৫৯৪	২৮,৩৬৭	৫৫,৯৬১
পুরাতন মালদা	১৮,৮২২	১৭,৭৫০	৩৬,৫৭২	১০,০৪৮	১০,১৪৪	২০,১৯২

ব্লক	তফশিলী জাতি			তফশিলী উপজাতি		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
ইংরেজবাজার	১৮,২৬২	১৬,৮২৩	৩৫,০৮৫	১,৯৮২	১,৯৭৪	৩,৯৫৬
মানিকচক	১২,৫২৭	১১,৬৬৫	২৪,১৯২	১১,২০৪	১০,৪৬৪	২১,৬৬৮
কালিয়াচক - ১	৪,৩৩৭	৪,০০০	৮,৩৩৭	৫৮	৪৯	১০৭
কালিয়াচক - ২	৮,৯৬৭	৮,৩৮২	১৭,৩৪৯	১০	৩	১৩
কালিয়াচক - ৩	১১,৫০১	১০,৮৫০	২২,৩৫১	৩৮৭	৩৪৫	৭৩২
পৌরসভা						
পুরাতন মালদহ	৫,৮৩১	৫,৫৩৪	১১,৩৬৫	২০৯	২০৫	৪১৪
ইংরেজবাজার	৯,৩৬৩	৮,৯৩৪	১৮,২৯৭	৯১১	৮৪০	১,৭৫১

উল্লেখ্য, এই জেলায় কিছু অংশ দৈহিক প্রতিবন্ধী মানুষও রয়েছে। এর মধ্যে অস্থি সংক্রান্ত, শ্রবণ সংক্রান্ত, দৃষ্টি সংক্রান্ত, মূক ও বধির এবং কিছু মানসিক প্রতিবন্ধীও দেখা যায়।

৩.৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ

জগৎ পরিবর্তনশীল। টোল, চতুষ্পাঠী ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে গেল। ইংরেজরা এদেশে এসে বিদ্যালয় বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে হেনরী ক্রেটন বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য দেশের প্রথম পাঠশালা বা স্কুল মালদহের গুয়ামালতিতে স্থাপন করেন।[৮৮] তারপরে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে এবং বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপণ করেন।[৮৯] ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় মালদা জেলা স্কুল। তারপরে 'কালাচাঁদ স্কুল ১৮৫৯ সালে, আড়াইড়াঙ্গা ডি.বি.এম. অ্যাকাডেমি ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'[৯০] এরপরে অনেক সাধারণ বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় এই জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মালদহ কলেজ। ১৯৭০ সালে মহিলা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ - ০৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা দেওয়া হল[৯১] —

Primary - 1892

Middle - 63

High - 182

Higher Secondary - 96

General College - 8

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচীতে S.S.K. ও M.S.K. এবং শিশু শিক্ষাকেন্দ্র অনেকগুলি যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছেন রাজ্য সরকার। উত্তর দিনাজপুর (রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ বাদে), দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার সমস্ত কলেজ নিয়ে ইংরেজবাজার শহরের কাছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই জেলায় একটি সরকারী বি.এড. কলেজ এবং অনেকগুলি বেসরকারী বি.এড. কলেজ রয়েছে। তাছাড়া, পলিটেকনিক কলেজ ও আই.টি.আই - কলেজও রয়েছে। ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় আড়াই কি.মি. দূরে I.M.P.S. নামে একটি বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার মালদহের প্রাক্তন রেলমন্ত্রী স্বর্গীয় গনিখান চৌধুরী নামাঙ্কিত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ও রয়েছে। মালদা জেলা হাসপাতালে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। ২টি সাধারণ কলেজ বেড়ে হয়েছে ১০টি।

উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ জেলায় অনেকগুলি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, আবার কয়েকটি বেসরকারীও রয়েছে। শহর এবং গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক নার্সারি এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুল। কিছু বেসরকারী আবাসিক বিদ্যালয়ও রয়েছে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার সাক্ষরতার হবে নিম্নরূপ[১২] —

মোট সাক্ষর - ৫০.৩০%

পুরুষ সাক্ষর - ৫৮.৮০%

নারী সাক্ষর - ৪১.৩০%

মালদহ জেলায় বেশ কিছু সরকারী ও বেসরকরী গ্রন্থাগার রয়েছে। মালদা জেলা গ্রন্থাগার ও টাউন লাইব্রেরি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য গ্রামীণ গ্রন্থাগার রয়েছে।

- সংস্কৃতি ঃ

মিশ্র সংস্কৃতির জেলা মালদহ। এ জেলার সংস্কৃতি দুটি পর্যায়ে উল্লেখ করব —

ক) সাধার সংস্কৃতি (General Culture)

১। নাট্যচর্চা ও অভিনয়, থিয়েটার প্রভৃতি

২। কবিতা রচনা, পাঠ ও আবৃত্তি এবং সাহিত্য চর্চা।

৩। সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা।

৪। ইতিহাস চর্চা

৫। গবেষণা ও গবেষণা ধর্মী।

৬। অন্যান্য

খ) লোক সংস্কৃতি (Folk Culture)

১। গম্ভীরা।	২। আলকাপ।
৩। মনসাগান।	৪। হোলির গান।
৫। ডোমনি।	৬। ভালভুলে বা সোনা রায়ের পূজার গান।
৭। বিয়ের গান / গীদ্।	৮। জিতাষ্ট্রমীর গান / গীদ্।
৯। কর্মাধর্মার গান / গীদ্।	১০। যোগীর (যুগীর) গান।
১১। মঙ্গলচণ্ডীর গান / গীত।	১২। রামলীলা।
১৩। ঝাড়নি গান।	১৪। সান্ঝা পূজার গান।
১৫। বউ পর্থৌনি'র গান।	১৬। কীর্তন (নাম সংকীর্তন, পালাকীর্তন, শ্রদ্ধের কীর্তন)
১৭। ছাদ পিটানোর গান।	১৮। কাওয়ালি।
১৯। বিভিন্ন ধরনের ছড়া ও লোক গান।	২০। লোক কাহিনী।
২১। প্রবাদ ও প্রবচন।	২২। ধাঁধা বা ফাট্কি।
২৩। ঝুমুর বা ঝুমরিয়া গান।	২৪। মানব পুতুল নাচ।
২৫। প্রভৃতি	

উল্লিখিত লোক সংস্কৃতির বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু বিষয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। ঝাড়লি গান মুসলমানদের মহরমের সময় গীত হয়। সাধারণ সংস্কৃতি সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষণীয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। তাই এ জেলাকে মিশ্র সংস্কৃতির জেলা বলা যায়।

৩.৬. জীবিকা ঃ

এই জেলার বেশীর ভাগ মানুষই কৃষিজীবী। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এই পেশার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার জীবিকাগত বিভাজন নিম্নরূপ[৩৩] —

Cultivators -	2,79,276	20.83%
Agricultural Labours -	4,11,862	30.72%
House hold Ind workers -	2,09,307	15.61%
Other workers -	4,40,261	32.84%
Main Workers -	9,67,143	29.39%
Marginal workers -	3,73,563	11.35%

Total Workers-	13,40,706	40.74%
Non Workers -	19,49,762	59.26%

কৃষিকাজ ছাড়াও বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা - বাণিজ্য করে দিনযাপন করে। বেশির ভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়িক। অনেক মানুষ আম, রেশম ও মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া অনেকে লিচু, কলা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি ফল এবং শাক সবজি চাষ করে দিন অতিবাহিত করে।

মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশই বেকার, কর্মহীন। ফলে অনেক মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করে। তারা বেশীর ভাগই অসংগঠিত শিল্প ও নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তবে কিছু সংখ্যাক মানুষ বিদেশে বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দেশেও কাজ করতে যায়। সবচেয়ে বিষাদান্তক ঘটনা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করতে গিয়ে কোন শ্রমিকের দেহ যখন কফিন বন্দি হয়ে এ জেলায় আসে। উল্লেখ্য, এ জেলায় পুরুষ এবং নারী উভয়ই শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালায়। শহরাঞ্চলে দরিদ্র নারীরা বহু লোকের বাড়িতে পরিচারিকা ও গৃহকর্মের সাথে যুক্ত। গ্রামাঞ্চলে নারীরা কৃষিকাজ ও গৃহস্থদের বাড়িতে পারিশ্রমিকে কাজ করে। অনেক পরিবারে বিড়ি শিল্প জীবিকা নির্বাহের বিরাট বড় উৎস। গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের কিছু মহিলাদেরকে সব্জি বিক্রেতা হিসেবে দেখা যায়। গৃহস্থ পরিবারের অনেকে বাড়িতে উৎপাদিত পণ্য হাটে-বাজারে বিক্রি করে। খাসি ও মুরগীর মাংস বিক্রি করেও কিছু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করতেই হয়, কয়েক দশক আগে মানুষ যেমন অর্ধাহারে বা দারিদ্রের মধ্যে দিনযাপন করেছে এখন কিন্তু সে রকম দৃশ্য আর প্রায় দেখায় যায় না। মানুষের উপার্জন বেড়েছে প্রায় ঘরে ঘরে মোবাইলের ব্যবহার এবং মোটরসাইকেলের ছড়াছড়ি দারিদ্রকে বনবাসে পাঠিয়েছে।

৩.৭. ধর্ম ঃ

মালদহ জেলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ' এক দেহে হয়েছে লীন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষের সহবস্থান লক্ষ্যণীয়। এ জেলায় ১৯৭১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা—

সম্প্রদায়	১৯৭১[৯৪]	১৯৮১[৯৫]	১৯৯১[৯৬]	২০০১[৯৬]
হিন্দু	৯,১৩,২৮৩	১১,০৭,১৯২	১৩,৭৭,৮৪৪	১৬,২১,৪৬৮
মুসলমান	৬,৯৫,৫০৪	৯,১৯,৯১৮	১২,৫২,২৯২	১৬,৩৬,১৭১
খৃষ্টান	৩,৪৯২	৪,০২০	৫,১১৮	৮,৩৮৮
বৌদ্ধ	৫১	১০৮	৬৪	১৬৪
জৈন	১৯১	৩৫৯	২২৪	২৯৩
শিখ	১৩৬	১২৭	১৮৩	২৮৩
অন্যান্য	—	—	১,৩০৭	২২,৩৫০
ধর্মের উল্লেখ নেই এরূপ	—	—	—	১,৩৫১

মালদহ জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শতকরা হার[৭৮]

সম্প্রদায়	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৫২.২৪৯৮%	৪৯.২৭৭৭৩%
মুসলমান	৪৭.৪৮৮৬৯%	৪৯.৭২৪৫৬%
খৃষ্টান	০.১৯৪০৮%	০.২৫৪৯%
বৌদ্ধ	০.০০২৪২%	০.০০৪৯৮%
জৈন	০.০০৮৪৯%	০.০০৮৯%
শিখ	০.০০৬৯৩%	০.০০৮৬%
অন্যান্য	০.০৪৯৫৬%	০.৬৭৯২৩%
ধর্মের উল্লেখ নেই এরূপ	—	০.০৪১০৫%

এই জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে আবার উপশ্রেণি / উপসম্প্রদায় রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবপন্থীর পাশাপাশি তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রপন্থী সম্প্রদায় এর উপস্থিতিও দেখা যায়। শাক্তপন্থীদের মধ্যে কেউ দেবী দুর্গা বা কালির উপাসক, কারো উপাস্য মঙ্গলচণ্ডী, আবার কারো বা উপাস্যদেবী মনসা। বৈষ্ণব পন্থী ছাড়াও অনেক সাধারণ হিন্দু রাধা-কৃষ্ণের ভজনা ও সংকীর্তন করে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নাম সংকীর্তন ও পালা কীর্তনের আসর বসে। সরাসরি শিবের উপাসনা ছাড়াও গম্ভীরা উৎসবের মধ্য দিয়ে শৈব সাধনা করা হয়। কিছু কিছু পূজা উচ্চবর্ণ - নিম্ন বর্ণের মধ্যে সীমিত না থেকে তা সার্বজনীন হয়ে পড়েছে।

কয়েক শতক ধরে হিন্দুদের পাশাপাশি সহবস্থান করছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী। ২০০১ সালের জনগণনানুসারে এই জেলার সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। শেখ, সৈয়দ, শেরশাবাদিয়া, মোগল, পাঠান সহ মুসলমান সম্প্রাদায়ের অনেকগুলি শ্রেণিই দেখা যায়। 'পীর'কে মান্য করা এবং না করা হিসেবে এখানকার মুসলমান সমাজ 'হানাফি' এবং 'সাইফি' এই দুভাগে বিভক্ত। মহরমকে কেন্দ্র করেও এই রকম বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। একদল মহরম করেন আর অন্য দল এই বিষয়টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। তবে মালদা জেলার বেশীর ভাগ অংশেই মহরম জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। এই সম্প্রদায়ের আরেক শ্রেণি যেমন - সব্জি, ধুনিয়া, জোলা, নৈস্যশেখ, পামারিয়া সম্প্রদায়ের মানুযেরাও একেশ্বরবাদী এবং একমাত্র 'আল্লাহ' তে বিশ্বাসী। শুধু রীতিনীতিতে পরস্পর পরস্পর থেকে একটু স্বতন্ত্র্য।

পাল বংশের হাত ধরে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জগজীবনপুর বৌদ্ধ বিহার এক সময় খুব বিখ্যাত ছিল। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অবস্থান করতেন। বর্তমানে এই জেলায় বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই নগন্য। ২০০১ সালের জনগণনানুসারে মাত্র ১৬৪ জন। জৈনধর্মের কিছু মানুষও এখানে বসবাসকরেন। এরা অন্য রাজ্য থেকে এসেছেন এবং দীর্ঘকাল থেকে বাণিজ্য করছেন। ২০০১ সালের জনগণনায় এদের সংখ্যা ২৯৩ জন। শিখ ধর্মের মানুষ ২০০১ সালের জনগণনানুসারে রয়েছেন ২৮৩ জন। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খৃষ্টান পাদরিরা এ জেলায়

আসেন। ফলস্বরূপ, কিছু খৃষ্টান জেলার বিভিন্ন জায়গায় বাস করেন। ২০০১ সালের জনগণনানুসারে এদের সংখ্যা ছিল ৬,৩৮৮ জন। এরা অধিকাংশই ধর্মান্তরিত। বেশীর ভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। মূলতঃ দারিদ্রতা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষার সুযোগ লাভের জন্য খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী শহরাঞ্চলে ৪২৬ জন এবং গ্রামাঞ্চলে ৭,৯৬২ জন খৃষ্টান বসবাস করেন। হবিবপুর এবং গাজোল ব্লকেই সংখ্যা বেশী। জেলায় তাদের কয়েকটি চার্চ রয়েছে।

এছাড়া এ জেলায় অন্যান্য সম্প্রদায় এবং ধর্মের উল্লেখ নেই এ রকম জনগোষ্ঠীও রয়েছে।

৩.৮. শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

কোন বড় ও ভারী শিল্প এই জেলায় না থাকলেও শিল্পের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ বহু কাল থেকেই রয়েছে। ‘‘কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পৌন্ড্রবর্ধনে এই ধরনের সূক্ষ্মমূল্যবান রেশমি কাপড় তৈরী হতো। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে পৌন্ড্রবর্ধন বা গৌড়ের রেশম শিল্পের উল্লেখ প্রমান করে যে মৌর্য যুগ অথবা তার আগে থেকেই এই অঞ্চলের রেশম শিল্প সুবিখ্যাত। কেবল প্রাচীন যুগেই নয়, মধ্য যুগও যে মালদার রেশম শিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ মেলে আইন-ই-আকবরী থেকে। আইন-ই-আকবরীতে ‘গঙ্গাজল’ নামে এক অতি মূল্যাবান রেশমি কাপড়ের উল্লেখ আছে, যা তৈরি হতো কেবল গৌড়ে।’[৯৯] রেশম কুঠি স্থাপণের কারণেই ধীরে ধীরে ইংরেজবাজার শহরটি গড়ে উঠে। এক সময় এই জেলায় অনেকগুলি রেশম কুঠি ছিল এবং কয়েকটি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও অনেক তাঁতিরা নিজেদের বাড়ির তাঁতে রেশমজাত দ্রব্য তৈরি করতেন। সুতি শিল্পেরও অস্তিত্ব ছিল। রেশম শিল্প ছাড়াও সেই সময় বেশ কিছু নীল তৈরির কারখানা ছিল। ‘‘১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ মালদায় অন্তত কুড়িটি নীল তৈরির কারখানা ছিল। এগুলো অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় পুঁজি এবং উদ্যোগের উপর নির্ভর করে।’’[১০০]

বিংশ শতকের প্রথম দিকে কাঁসা ও পিতল শিল্পও মালদার অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে ছিল। সমকালে লাক্ষা শিল্পের জন্যও এ জেলার খ্যাতি ছিল। বাঁশজাত কিছু কুটির শিল্পও ছিল। পূর্বের মতো রেশম শিল্পের গৌরব না থাকলেও রেশম এখনও এ জেলায় উৎপাদিত হয়। বেসরকারী উদ্যোগে ইংরেজবাজরের অমৃতি এবং পুরাতন মালদহের নারায়ণপুরে রেশমের সুতো তৈরির কারখানা রয়েছে। অর্থকরী ফসল আম ও লিচু চাষও ভাল হয়। এখানে কয়েকটি ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পও গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে গীতা ও ম্যালকোজ সবিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তারা নানা ফলের আচার, জ্যাম, জেলি, জুস ইত্যাদি তৈরি করে বাইরে পাঠায়। মালদা জেলার আম বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। আগে নদী পথে ‘ঢাকাইয়া’ নৌকায় আম বাংলাদেশে যেত। এখন সড়কপথে সেখানে আম রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য দেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে মালদার আম। কুটীর শিল্পের মধ্যে বিড়ি শিল্প খুব উল্লেখযোগ্য। সারা ভারতবর্ষে এ জেলার বিড়ি পাওয়া যায়। সুজাপূর ও কালিয়াচক অঞ্চলে প্লাস্টিকের কয়েকটি ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। ২০০৫ - ০৬ সালের তথ্যানুযায়ী এই জেলার ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ৮, ৭৫৬ টি এবং নিবন্ধিকৃত শিল্প বা কারখানার সংখ্যা ৫৪টি।[১০১]

ব্যবসায়ের পীঠস্থান ছিল মালদহ (বর্তমান নাম পুরাতন মালদহ), এবং তার পরে ইংরেজবাজর এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদহ শহর ছাড়াও জেলার অনেকগুলি স্থান ধীরে ধীরে ছোট

খাটো শহর হয়ে উঠছে। তার মধ্যে হল — গাজোল, কালিয়াচক, চাঁচল, রতুয়া, সুজাপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, বুলবুলচন্ডী, মোথাবাড়ী, হবিবপুর, বামনগোলা, মানিকচক, মথুরাপুর, আইহো, পঞ্চনন্দপুর, বৈষ্ণবনগর, অমৃতি, মিল্কি, সাতটারী, সামসী, আলমপুর, নারায়ণপুর, আট মাইল ইত্যাদি।

এছাড়া অনেক গ্রামে গঞ্জে প্রতিদিন বাজার বসে। রয়েছে বড় বড় সাপ্তাহিক হাট, আবার কতকগুলি সপ্তাহে দু'দিন বসে। গরু, ছাগল, থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিস বেচা-কেনা হয়।

৩.৯. খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থান ঃ

- **খাদ্য ঃ**

এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসীর খাদ্য ভাত। গমের রুটিও প্রচুর পরিমানে চলে। পাশ্ববর্তী বিহার ও ঝাড়খন্ড থেকে অনেক মানুষ আসায় ছাতু খাওয়ার প্রচলনও রয়েছে। প্রায় ৩০ - ৩৫ বছর পূর্বে গ্রামঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল রুটি ও ছাতু। তখন দারিদ্রতা থাকার জন্য মানুষেরা চাল কিনে ভাত খেতে পারত না। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টেছে। ভাত হয়েছে প্রধান খাদ্য। ছাতু এত দুর্মূল্য যে তা সবাই কিনে খেতে পারে না। বরিন্দ অঞ্চলে ছাতু খাওয়ার অভ্যাস কম। দিয়ারা অঞ্চলে গৃহস্থ এবং অবস্থাপন্ন বাড়িতে ছাতুর ব্যবহার রয়েছে।

গমের রুটি প্রায় সারা বছরই লোকে খায়। শীতকালে কলায়ের রুটি লবণ, লংঙ্কা দিয়ে অনেকে খায়। খুবই সুস্বাদু। ছাতুর পুর দেওয়া লিট্টি, ডালের পুর দেওয়া ডালপুরি ও অনেকে খায়। ছোলা ও মটরের ঘুগনিও প্রচুর বিক্রি হয়। বড় পিঠা ও ছোট পিঠাও খাওয়া হয়। তিসি, তিল, নারকেল ইত্যাদি পুর দেওয়া আতপ চালের পিঠা শীতাকালে খেয়ে থাকে। মালপুয়া ও বিভিন্ন উৎসবে বেশ উপাদেয় খাদ্য গুড়, ছোট পিঠা ও চাল মিশিয়ে তৈরী 'রাশিয়া' বেশ জমিয়ে খাওয়া হয়। গমের আটা দিয়ে ঘোল করে 'চিতুয়া' তৈরি করে খায়। আটা-গুড় দিয়ে তৈরি খবউনি, বিভিন্ন পার্বণে খাওয়ার রীতিও লক্ষ্যণীয়। চাল ভাজা, মুড়ি, পান্তাভাত জলখাবার হিসাবে অনেকে সকালে খায়। শহরাঞ্চলে ফুচকা, মোমো, চাউমিন খাওয়ার প্রবণতা শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে।

এ জেলায় প্রচুর পুকুর, খাল, বিল ও নদী থেকে মাছ পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের 'অন্ধ্র' এবং হাওড়ার মাছ প্রচুর আমদানি হয়। এখানকার জনগণ ভাতের সঙ্গে মাছ' এর তরকারিকে আবশ্যিক পদ হিসাবে ব্যবহার করে। মাংসের প্রচলনও রয়েছে। খাসি, ভেড়া, মুরগি, হাঁস, পায়রার মাংসও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন কোন গোষ্ঠী শূকরের মাংসও খায়। দেশি মুরগি এবং ব্রয়লার মুরগির মাংসও ভাল চলে। মুসলমানেরা গোমাংস যায়। ঈদ্ এবং বকর ঈদ্ (ইদু-উ-জ্জোহা) এর সময় উটের মাংসও এরা খায়।

- **বস্ত্র ঃ**

মালদহের মানুষ বাঙালীদের মতই পোযাক - পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। তবে 'ধোতি' (ধুতি)র ব্যবহার কমেছে। উৎসব - অনুষ্ঠানে ধুতি পরিধান করে। তবে সবচেয়ে বেশি লুঙ্গি বা 'তহবন্' ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বেশী ব্যবহার করে। মুসলমানের মধ্যে পাজামা, পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি বা তহবন এর ব্যবহারই বেশী। হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা সাধারণতঃ শাড়ী পরিধান করে দেখা যায়। যুবতীরা চুড়িদার, সালোয়ার-কামিজ ব্যবহার করে। ইদানিং

মেয়েরাও ছেলেদের মতো জিন্স - এর প্যান্ট বেশি ব্যবহার করতে ধরেছে। শহরাঞ্চলেরা মহিলারা শাড়ী ছাড়া চুড়িদার এবং নাইটি ব্যবহার করে। গ্রামে নাইটির ব্যবহার খুবই নগন্য। গ্রামাঞ্চলে মহিলারা শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়াও শাড়ি পরে। ঘোমটা দেওয়ার রীতি কমে আসছে। তবে বৃদ্ধারা সংস্কারকে ধরে রাখার চেষ্টা করে।

● বাসস্থান ঃ

গ্রামাঞ্চলে মাটির বাড়ি বেশী। খুব কম সংখ্যায় কুঁড়েঘর দেখা যায়। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় প্রচুর মাটির বাড়ি ভেঙ্গে যায়। অনেকে ভাঙা ঘরে বাস করে। যাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তারা ধীরে ধীরে পাকা বাড়ি বানিয়ে বসবাস করে। টালির ঘরই বেশী। টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়িও প্রচুর রয়েছে। বরিন্দ অঞ্চলে কিছু কিছু মাটির দোতালা বাড়িও রয়েছে। খড়ের ছাউনিও গ্রামাঞ্চলে লক্ষ্যণীয়। কিছু কিছু সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের মধ্যে তালপাতার ছাউনি দেখাও যায়। দিয়ারা অঞ্চলে বাঁশ, পাটকাঠি, চাটাই, রাহাড় (অড়হড়) এর ডাল, লম্বা লম্বা খাগরা ঘাষ ইত্যাদির দেওয়াল বানানো হয়। আবার তাতে কেউ কেউ মাটির প্রলেপ দিয়ে দেয়। ইদানিং পাকা ঘরও অনেক দেখা যায়। কেউ কেউ শৌচালয়ও বানায়। পূজার ঘর বাসগৃহ থেকে আলাদাভাবে নির্মান করে। শহরাঞ্চলে বেশির ভাগ বাড়িই পাকা দোতলা ও তিনতলাও লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজবাজার শহরে অনেক ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে এবং হচ্ছে।

৪. মালদহ জেলা ঃ প্রশাসনিক বিভাজন ঃ

মালদহ জেলা ৮টি থানা নিয়ে ১৮১৩ সালে গঠিত হয়। ৮টি থানা ছিল দিনাজপুর জেলার মালদহ ও বামনগোলা থানা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট ও গরগরিবা এবং রাজশাহীর অর্ন্তগত রোহনপুর ও ছুপি। স্বাধীনতা লাভের আগে এই থানা এলাকাগুলিকে পুর্নবিন্যাস করে ১৫টি থানা করা হয়। থানাগুলি হল — ১. ইংরেজবাজার; ২. মালদা; ৩. রতুয়া; ৪. হরিশ্চন্দ্রপুর; ৫. খরবা; ৬. গাজোল; ৭. হবিবপুর; ৮. বামনগোলা; ৯. মানিকচক; ১০. কালিয়াচক; ১১. শিবগঞ্জ; ১২. নবাবগঞ্জ; ১৩. ভোলাহাট; ১৪. নাচোল এবং ১৫. গোমস্তাপুর। স্বাধীনতার পর এই পনেরোটি থানার মধ্যে শেষোক্ত ৫টি থানা অর্থাৎ শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল এবং গোমস্তাপুর পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত হয়। বাকি ১০টি থানা নিয়ে গড়ে ওঠে স্বাধীনোত্তর মালদহ জেলা। ১৯৭২ সালের ৮ই মে 'খরবা' থানার পরিবর্তে হয়েছে চাঁচল থানা। ১৯৮৮ সালের ১৩ই মার্চ কালিয়াচক থানার একটি অংশ নিয়ে নূতন একটি থানা হয়েছে বৈষ্ণবনগর।[১০২] ১৯১৯ সালের সেন্সাসে লিখিত আছে — "The district of Maldah now includes 11 police stations, of which 10 police station were there during1981 census and 1 new police station named Baishnab Nagar was created before 1991 census. It also includes 15 Community Development Blocks and one Sub-Division (Sadar) with its District Headquarters located at the Maldah town locality known as 'English Bazar'[১০৩]

মালদহ জেলায় পূর্বে একটি মহকুমা (ইংরেজবাজার সদর) ছিল। ২০০১ সালের ১লা এপ্রিলে সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয় মহকুমা চাঁচল। ২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী সদর মহকুমাতে ১,২৭৪টি মৌজা এবং চাঁচল মহকুমায় ৫২৪টি মৌজা রয়েছে। এর মধ্যে সদর মহকুমায় ১,১৩৯টি এবং চাঁচল মহকুমায় ৫০২টি মৌজায় মানুষ বসবাস করে। ২০০১ সালের তথ্যানুযায়ী

এই জেলার মোট মৌজার সংখ্যা ১,৭৯৮টি হলেও মানুষ বসবাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা ১৬৪১টি এবং মোট বাড়ির সংখ্যা ৬,৩১,৯৩৫টি। ২০০৫ সালের তথ্যানুযায়ী মালদহ জেলার প্রশাসনিক চিত্রটি এইরকম —[১০৪]

মহকুমা	থানা	ব্লক / পৌরসভা	গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম সংসদ	পঞ্চায়েত সমিতি	ওয়ার্ড
চাঁচল	৩	৬ / ০*	৪৯	৭০৫	৬	—
	হরিশ্চন্দ্রপুর	হরিশ্চন্দ্রপুর-১	৭	১০৫	১	—
		হরিশ্চন্দ্রপুর-২	৯	১২০	১	—
	চাঁচল	চাঁচল-১	৮	১২১	১	—
		চাঁচল-২	৭	১০৮	১	—
	রতুয়া	রতুয়া-১	১০	১৪৮	১	—
		রতুয়া-২	৮	১০৩	১	—
সদর	৮	৯/২	৯৭	১৩০৩	৯	৪২
	গাজেল	গাজোল	১৫	১৯৬	১	—
	বামনগোলা	বামনগোলা	৬	৮৯	১	—
	হবিবপুর	হবিবপুর	১১	১৪৩	১	—
	মালদা	ওল্ড মালদা	৬	৮৭	১	—
		ওল্ড মালদা (পৌরসভা)	—	—	—	১৭*
	ইংরেজবাজার	ইংরেজবাজার	১১	১৪৪	১	—
		ইংরেজবাজার (পৌরসভা)	—	—	—	২৫
	মানিকচক	মানিকচক	১১	১৫৪	১	—
	কালিয়াচক	কালিয়াচক-১	১৪	১৯৫	১	—
		কালিয়াচক-২	৯	১০৮	১	—
	বৈষ্ণবনগর	কালিয়াচক-৩	৯	১০৮	১	—
মোট - ২	১১	১৫/২	১৪৬	২০০৮	১৫	৪২

* সম্প্রতি চাঁচলকে পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও সরকারীভাবে এখনও পৌরসভার কাজ শুরু হয়নি।

* ওল্ড মালদা পৌরসভায় একটি ওয়ার্ড সংযোজিত হয়ে বর্তমানে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১৮টি হয়েছে।

এই জেলায় ২টি সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্র - ১. উত্তর মালদা এবং ২. দক্ষিণ মালদা। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনী ক্ষেত্র রয়েছে ১২টি। এগুলি হল — ১. ইংরেজবাজার (সাধারণ); ২. ওল্ড মালদা (তফশিলী জাতি); ৩. গাজোল (তফশিলী জাতি); ৪. হবিবপুর (তফশিলী উপজাতি); ৫. মোথাবাড়ী (সাধারণ); ৬. মানিকচক (সাধারণ); ৭. চাঁচল (সাধারণ); ৮. হরিশ্চন্দ্রপুর (সাধারণ); ৯. সুজাপুর (সাধারণ); ১০. রতুয়া (সাধারণ); ১১. বৈষ্ণবনগর (সাধারণ) এবং ১২. মালতীপুর (সাধারণ)।

৫. ভাষা ঃ

৫.১ মালদহে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো মালদহ জেলারও প্রধান ভাষা হল বাংলা। তাছাড়া সাঁওতালী, খোট্টা, হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভাষা প্রচলিত। সুদীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির বসবাস, বিহার ও ঝাড়খণ্ড প্রদেশের নৈকট্য, জীবিকা অর্জণের প্রয়োজনে একটা বিশাল সংখ্যক অ-বাঙালী জনগণের আগমন হেতু এই জেলার ভাষীক মানচিত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কথ্য ভাষাকেও বৈচিত্র্য দান করেছে, যা তাকে ভাষা বিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। সেই কারণে প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেব লিখেছেন — "Malda, as the meeting place of several languages, would form an interesting study to the comparative philologist. Curiously enough, language is much more distributed by race than according to locality."[১০৫] তাছাড়া তিনি আরও লিখেছেন — "Indeed all over Malda District, we found a curious mixture of the language, different nationalities andTribes in one and the same village each speaking its own language which may be Santali, Bihari or Bangali"[১০৬]

ভাষার এই অদ্ভুত রকমের মিশ্রণের কারণ হিসাবে বলা যায়, এই অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইতিহাসের প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধন নগরী থেকে গৌড়, মালদহ ইংরেজবাজার বিবর্তনের এই সুবিশাল পরম্পরায় এই অঞ্চলটি বুকে ধরে রেখেছে শত-সহস্র-লক্ষ-লক্ষ মানুষের কলতান। পাল-সেন-পাঠান-মোগল-ইংরেজ শাসিত এই অঞ্চল বহু সংস্কৃতির ধারায় স্নাত। এক সময় বাংলার রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে বহু মানুষ রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা জীবিকাগত কারণে এসেছেন। এর পাশাপাশি সাঁওতাল পরগণা থেকে আদিবাসীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজন, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু হিন্দুর দল, মুর্শিদাবাদ থেকে বহু মুসলমান পরিবার এবং বিহার ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে মৈথিলি ব্রাহ্মণসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী এ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাই এই জেলাকে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণও বলা যেতে পারে। বহু সংস্কৃতির মেল বন্ধনে তাই এখানকার ভাষাগত রূপটিও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'The languages Bengali, Sāntāli, Khottā, Hindi, Urdu, Orāon, Oriyā, Pāhāriā and Mundāri between them account for almost the entire population of the district.'[১০৭] আবার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে

পাই – এই মালদহ জেলায় ৪৮টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে।[১০৮] শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে গেলেই ভাষা-বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায় এ জেলার মোট জনসংখ্যার ৮৩.৬% বাংলায়; ৭.১৯% সাঁওতালী ভাষায়, ৪.১% খোট্টা ভাষায়, ২.৫% হিন্দী ভাষায় এবং ১.৭% উর্দু ভাষাতে কথা বলেন। এছাড়া ৪,২৪৭ জন ওঁরাও ভাষাতে; ২০২১ জন ওড়িয়া ভাষায়, ১,৫০৭ জন পাহাড়িয়া ভাষাতে এবং ১,০২২ জন লোক মুণ্ডারী মাতৃভাষায় কথা বলতেন।[১০৯] ৫০ / ৫১ বছর পূর্বের বিবরণ থেকে যা পরিসংখ্যান পেলাম বর্তমানে তার সংখ্যা বহু বেশী হবেই। কেননা, জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাভাষাতে (৮৩.৬%) এ জেলার লোক বেশী কথা বলেন। Excepting the police station of Malda, Habibpur, Gazol and Bamangola in all other areas of the district more than 75 percent of the population have Bangali, as their mother tongue.[১১০] এ জেলায় যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারাও দ্বিভাষিক (bilingual)[১১১] এই জেলায় বাংলা ভাষার পরে সাঁওতালী ভাষার স্থান। মালদহ, হবিবপুর, গাজোল এবং বামনগোলা থানায় বেশী সংখ্যক সাঁওতালী ভাষা ব্যবহৃত হয়। হবিবপুর থানায় প্রায় ৪০% লোক সাঁওতালী ভাষায় কথা বলেন। এরাও দ্বিভাষিক। বাড়িতে এরা নিজেদের মধ্যে এবং নিজস্ব সমাজ গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষা সাঁওতালীতে কথা বলেন আর অন্যত্র অন্যভাষাভাষীদের সাথে কথ্য বাংলা ব্যবহার করেন। তবে বাংলা উচ্চারণ যথাযথ হয় না, তাদের নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গী যুক্ত হয়। বিহার সংলগ্ন এলাকা এবং ইংরেজবাজার, কালিয়াচক এবং মানিকচকের লোকেরা বাংলা ও হিন্দী মেশানো খোট্টা বা খোর্থা ভাষায় কথা বলেন। 'Slightly more than 25,000 of such speakers have been found to be residing in Kaliachak police station and nearly 20,000 persons speaking Khotta reside in English Bazar police station.[১১২] ইংলিশবাজার, মালদহ এবং হবিবপুর থানাতে প্রধানতঃ হিন্দী ভাষাভাষী দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানাতেও ভাল সংখ্যক লোক হিন্দীতে কথা বলেন। দিয়ারা অঞ্চলেই উর্দু ভাষাভাষীকে দেখা যায়। মানিকচক থানায় সবচেয়ে বেশী উর্দুভাষী দেখা যায় এবং 'about 3.00 percent of the population of Malda, English Bazar and Kaliachak police stations have returned their mother tongue as Urdu in 1961 Census.[১১৩]

বর্তমানে উত্তর মালদহের চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর ও রতুয়া রয়েছে। জেলার উত্তর অঞ্চলের কথ্য ভাষা ও ভাষিক মানচিত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে। এখানে বসবাসকারী জনগণকে ভাষাগত দিক থেকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষা; বাঙালদের কথ্য ভাষা; খোট্টা ভাষা। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীর কথ্য-ভাষা।[১১৪]

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে এবং পরে যে সমস্ত মানুষ পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস করছেন তাদের নিজস্ব উপভাষা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুন্ন রেখেই তারা কথাবার্তা বলেন। আর যেখানে তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ সেখানে তাদের ভাষা অন্য ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে। 'বরিন্দ অঞ্চলে মুসলিম সমাজের ভাষা স্থানীয় বাঙালী জনগোষ্ঠীর মতোই। শুধু কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে পার্থক্য রয়েছে'।[১১৫]

৫.২ খোট্টা ভাষা ঃ

বহু ভাষার জেলা মালদহ। 'In the district as many as 48 mother-tongues have been returned by its people in 1961 Census.'[১১৬] তার মধ্যে ৪.১% লোক খোট্টা ভাষাতে কথা বলেন। খোট্টা শব্দের অর্থ – (অবজ্ঞার্থে) হিন্দুস্থানী, বেহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দী ভাষাভাষী লোক।[১১৭] আবার রাজশেখর বসু 'খোট্টা' শব্দের অর্থ লিখেছেন — 'হিন্দীভাষী লোক (অবজ্ঞায়)'[১১৮] অর্থাৎ যে সমস্ত হিন্দুস্থানী বেহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা জীবিকা অর্জণের জন্য এ জেলায় এসে হিন্দী ভাষায় কথা বলতেন তাদেরকে স্থানীয় বাঙালীরা অবজ্ঞা করে খোট্টা বলত। আর এই খোট্টাদের ব্যবহৃত ভাষাকেই খোটা ভাষা বলে অভিহিত করেছেন বলে মনে করি। 'কিন্তু মালদহে তারা বাংলাভাষী একটি পৃথক জনগোষ্ঠীর সংশ্রবে আসে, যাদের সঙ্গে তারা নিজ সত্তা ত্যাগ করে পুরোপুরি মিশে যায় নি এবং নিজেদের কথ্য ভাষা পরিত্যাগ না করে ধরে রাখে। যদিও সময়ের কালপ্রবাহে এই ভাষার কথ্যভঙ্গিতে বাংলার কিছু উল্লেখযোগ্য উপাদান তারা ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে নেয়।'[১১৯] তাই Khotta is a dialect which came into existence as a result of the mixture of the Bengali and Hindi languages.[১২০] খোট্টা ভাষা আসলে একটি মিশ্র ভাষা অর্থাৎ বাংলা ও হিন্দী ভাষার মিশ্ররূপ।

"আধুনিককালের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে প্রয়োজনের তাগিদে দুইটি সম্পূর্ণভাবে অসম্পূর্ণভাবে অসম্পৃক্ত ভাষা সম্প্রদায় অথবা স্থায়ীভাবে সহাবস্থিত হইবার ফলে পরস্পর মিশ্রণে কাজ চালানো গোছের সরল ও সংক্ষিপ্ত বাক্‌রীতি উৎপন্ন করিয়াছে। এমন ভাষাকে বলা হয় মিশ্রভাষা (Jargon বা Mixed Language)"[১২১]

মালদা জেলার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, মানিকচক থানাতে সবচেয়ে বেশি লোকেরা খোট্টা ভাষাতে কথা বলে। তবে অন্যান্য থানাতেও কিছু কিছু মানুষ এই ভাষাতে কথা বলে থাকেন। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে কোন্ থানার কত জন মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন তা নিম্নরূপ—[১২২]

থানা	মোট (খোট্টাভাষী)	পুরুষ	মহিলা
ইংরেজবাজার	১৯,৯১৫	৯,৪৩৬	১০,৪৭৯
কালিয়াচক	২৫,৫৩৯	১২,৭৯১	১২,৭৪৮
ওল্ডমালদা	২৬৭	১১৮	১৪৯
হবিবপুর	৬৫৮	৩১৮	৩৪০
রতুয়া	১১	১১	—
মানিকচক	২,২৬০	১,১২৯	১,১৩১
খরবা (বর্তমানে চাঁচল)	৮১	১৯	৬২
হরিশ্চন্দ্রপুর	১৩৪	৭২	৬২
গাজোল	৭৯৬	৫৯৬	২০০
বামনগোলা	১৬৩	৮২	৮১
	৪৯,৮২৪	২৪,৫৭২	২৫,২৫২

উল্লেখ্য শহরে খোট্টা ভাষায় কথা বলত না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি — প্রতি দশ বছর অন্তর যে জনগণনা হয় তাতে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীর লোকেরা কি কি ভাষায় কথা বলেন এবং তাদের শতকরা হার কিছুই কিন্তু উল্লেখ করা হয় না। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বিভিন্ন ভাষার থানা ভিত্তিক এবং জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা কত হারে কোন্ ভাষা ব্যবহার করে সেই রকম রিপোর্ট পেলে বর্তমানে খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা যে বেড়েছে তা প্রকাশ করা সম্ভব হত।

মৈথিল ব্রাহ্মণরা হিন্দী এবং বাংলা ভাষা মিশিয়ে এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে। মৈথিল অধ্যুষিত এলাকায়, বিশেষতঃ মানিকচক ও রতুয়া থানার তথাকথিত নিম্নবর্গের হিন্দুরা এবং মুসলমানরাও ঐ একই ভাষায় কথা বলে। হিন্দী আর বাংলা মেশানো এই কথ্য ভাষাকে মালদায় খোট্টা ভাষা বলা হয়। টাল দিয়ারার অভিজাত মুসলমানরাও খোট্টা ভাষাতে কথা বলে। তবে তাদের ভাষা আর মৈথিলদের ভাষার মধ্যে সামান্য তফাত আছে। মৈথিলদের ভাষাতে ভোজপুরী ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। আর অভিজাত মুসলমানদের কথার উর্দুর টান ধরা পড়ে।[১২৩] খোট্টাভাষী কেওট, তিয়র, নাগর, লোহার, ধোপা, কুমোর, তেলি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈথিলী ভাষার ছই (Chhai) ক্রিয়াপদ এবং মগহী উপভাষার ক্রিয়াপদ hai (হ্যায়) হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে চাঁই সম্প্রদায় আর মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। শুধু মৈথিলি নয়, হিন্দীর অন্যান্য উপভাষা মগহী ও ভোজপুরীর সঙ্গেও আঞ্চলিক কথ্য ভাষার মিশ্রণে খোট্টার ভিন্ন ভিন্ন রূপ এই অঞ্চলে দেখা যায়। এছাড়াও বিহারের কূর্মীসহ বেশ কিছু অন্ত্যজ শ্রেণী তাদের ভাষার সঙ্গে এই অঞ্চলের কথ্য বাংলা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে আর এক ধরণের খোট্টার। পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ, যারা বিহার থেকে এসেছেন তাদের খোট্টা আলাদা। এমন কি যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণির খোট্টা লক্ষ্য করা যায়।[১২৩] 'The dialect is locally known as Khotta or as Khottai, and is principally spoken by people of the Chain, Nagar and other similar castes in West Malda. The language of each caste differs slightly.'[১২৫] ইংরেজবাজার, মানিকচক এবং কালিয়াচক থানার বিভিন্ন গ্রামে ঢুকলেই খোট্টা ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল সব গ্রামের খোট্টা ভাষা কিন্তু একরকম নয়। চাঁই, নাগর, বা লাগর, ধানুক, কেউট, তিয়র, তেলি, দোষাদ, কাহার, ধোপা, নাপিত, মুচি, লোহার, তাঁতী, তেলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের খোট্টা ভাষার শব্দ ব্যবহারে সাদৃশ্য দেখা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে মোমিন / জোলা, কুঁঝড়া ইত্যাদি কৌম গোষ্ঠীর মানুষেরা এ ভাষায় কথা বলেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের খোট্টা ভাষার মধ্যে হিন্দী শব্দের প্রাধান্য এবং হিন্দীর মতো উচ্চারণ হয়। এতে বাংলা শব্দ (তৎসম, তদ্ভব ইত্যাদি) মিশিয়ে থাকে। দেশি শব্দ যেমন থাকে তেমনি ইংরেজী শব্দ তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের খোট্টা ভাষার মধ্যে হিন্দীর সাথে আরবী এবং উর্দু শব্দের মিশ্রণ বেশী। বাংলা ও ইংরেজী কিছু কিছু ঢুকে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি "চাঁই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বকীয় ভাবধারায় একটি স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা চাঁই ভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষা হিন্দী, বাংলা, মৈথিলী, মাগহী ইত্যাদি বহু ভাষা ও উপভাষার সংমিশ্রণে গঠিত।[১২৬]আবার এই লেখকই অন্যত্র উল্লেখ করেছেন — "সাধারণতঃ নদী চর বা দিয়ারার একটি বাঁকানো ভূমিরেখা বরাবর বাস করে নাগর, ধানুক, বীন (বিন্দ) ও চাঁইরা। এদের বুলিও খোট্টা এবং তাতে মাগহী ও আওধির ছাপ রয়েছে। এদের প্রত্যেকটি প্রজাতির কথা ভাষায়, ক্রিয়ার ব্যবহারে এবং শব্দের উচ্চারণে বিশেষ ঝোঁক, টান ও কথনরীতি

এককে অন্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক করেছে।'[১২৭] খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারীরা দ্বিভাষা-ভাষী বা bilingual. 'The settlers from Bihar, Chhotonagpur and Santal Parganas are commonly bilingual.'[১২৮] এরা বাড়িতে, গ্রামে এবং বাইরের স্বজাতি ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে মাতৃভাষা খোট্টায় কথা বলে। আবার অন্যভাষা সম্প্রদায়ের লোকের সাথে ঐ সম্প্রদায়ের ভাষাতে কথা বলে থাকে। উচ্চারণে শব্দগত, ধ্বনিগত পার্থক্য থাকেই। এরা নিখুঁত বাংলা সহজে বলতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই ভাষাতে আজ পর্যন্ত কোন অক্ষর বা হরফ কেউ আবিষ্কার করেন নি। কারণ, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতা এর কারণ। তা করা থাকলে এই ভাষার মৌখিক সাহিত্য অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের চেয়ে যে কোন অংশে কম নেই তা প্রকাশ পেত এবং সভ্য সমাজে স্থান করে নিত। কিন্তু তা না হয়ে ওঠার কারণে বর্তমান প্রজন্মকে বাংলা ভাষাতেই বিভিন্ন বই-পত্র পড়তে হচ্ছে। জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে। বাড়িতে এবং বাইরে বাংলা ও অন্য ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে। বহু বাবা-মায়েরা চাইছেন তাদের শিশুরা বাংলা ভাষাতে কথা বলুক, নইলে তারা পিছিয়ে যাবে। এ কারণে বর্তমান প্রজন্মের কাছে খোট্টা ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছে এবং ভয় হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এই ভাষা কালগর্ভে হারিয়ে যাবে না তো!

তথ্যসূত্র

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী — গৌড়ের ইতিহাস পৃঃ - ৩৩

২। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস (প্রথম পর্ব) পৃঃ - ১৭

৩। সিদ্ধার্থ গুহ রায় — মালদা (১৩৯৮), পৃঃ - ২

৪। G.E. Lambourn — Bangal District Gazetters Malda, (Calcutta - 1918), Page - 1

৫। District Statistical Handbook, Maldah, 2006 TABLE 1.1 (The data collect from District Census Handbook 1961)

৬। Jatindra Chandra Sengupta — GAZETTER OF INDIA, WEST BENGAL, MALDA 1961, Page - 1

৭। Census of India 1991, Series -26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (page - XV)

৮। Census of India 2001, West Bengal, Maldah District, Page - 134

৯। District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE 1.1 (The data collect from District Census Handbook, 1961)

১০। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page - 84

১১। সুধীর কুমার চক্রবর্তী — গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ, প্রথম প্রকাশ, বিশ্বজ্ঞান, কলিকাতা, ১৯৮২ পৃঃ - ১৬৫

১২। আনন্দ গোপাল ঘোষ — মালদহ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকা, মালদহ চর্চা, পৃঃ - ৫১ (রত্না ঘোষ — 'মালদার গ্রামে পথে', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১৯৮৫)

১৩। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস — বাঙ্গলা ভাষার অভিধান, (দ্বিতীয় ভাগ (ন - ২) পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ (সংকলিত ও সম্পাদিত) সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯ পৃঃ - ১৪৯৪

১৪। G.E. Lambourn — Ibid, Page - 2

১৫। সুধীর কুমার চক্রবর্তী — তদেব, পৃঃ - ৯

১৬। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ২১

১৭। G.E. Lambourn — Ibid, Page - 2

১৮। আব্দুস সামাদ — মালদা স্থান নাম, পৃঃ - ৭৫

১৯। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস — তদেব, পৃঃ - ১০৭১

২০। G.E. Lambourn — Ibid, Page - 2

২১। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ৪

২২। সুধীর কুমার চক্রবর্তী — তদেব, পৃঃ - ৭

২৩। W.W. Hunter — A Statistical Accounts of Bengal, Vol - VII, Page - 361

২৪। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page - 5

২৫। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৯২

২৬। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ৬

২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ - ৬

২৮। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৯৪

২৯। অশোক কুমার বসু — পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী, পৃঃ - ২৯

৩০। মনোরঞ্জন চৌধুরী — মালদা জেলার জলাভূমি এবং তার জীব বৈচিত্র্য, মালদহ চর্চা, পৃঃ - ৮৫ - ৯৩

৩১। আনন্দ গোপাল ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৫১

৩২। G.E. Lambourn — Ibid, Page - 55

৩৩। ডঃ সুজয় ঘোষ — মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের বাংলা কথ্য ভাষা ঃ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১১

৩৫। Jatindranath Sengupta — Ibid, Page - 85

৩৬। ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় — জানা অজানার মালদহ, মালদহ বইমেলা, জানুয়ারী - ২০০৬, পৃঃ - ৬

৩৭। কালিপদ লাহিড়ী — গৌড় ও পাণ্ডুয়া, পৃঃ - ১২

৩৮। Census of India 1991, Series - 26, West Bengal, Village and Town Directory, Malda District, Page - XV

৩৯। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৩২ - ৩৩

৪০। ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় — তদেব, পৃঃ - ১১

৪১। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ১২

৪২। রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায় — গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল, পৃঃ - ১

৪৩। ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় — তদেব, পৃঃ - ১২

৪৪। শ্রীগোকুল বিহারী আগরওয়ালা, ব্যবসায়ের পীঠস্থান পুরাতন মালদহ, 'ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ, পৃঃ - ২৫

৪৫। ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় — তদেব, পৃঃ - ৯৩

৪৬। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৭৮

৪৭। M.O. Carter – Final Report on the survey and settlement operation in the District of Malda, 1928 - 1935 (Bengal, 1938), Page - 1

৪৮। W.W. Hunter — Ibid, Page - 1

৪৯। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ১৩

৫০। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ১৪

৫১। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ২

৫২। ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় — তদেব, পৃঃ - ৮

৫৩। H.H. Risley — The Tribes and caste of Bengal, Vol - II, Page - 64

৫৪। প্রবাল রায় — অতীতের মালদহ, পৃঃ - ৩

৫৫। সুধীর কুমার চক্রবর্তী — তদেব, পৃঃ - ১৬৫

৫৬। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page - I

৫৭। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ২

৫৮। ডঃ সুজয় ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৩ - ৪

৫৯। W.W. Hunter — Ibid, Page - 43 - 49

৬০। ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ — মালদহের লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ - ১২২

৬১। H.H. Risley — Ibid, Page - 224

৬২। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ১১

৬৩। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ১৪২

৬৪। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ১৪৬

৬৫। H.H. Risley — Ibid, Page - 57

৬৬। H.H. Risley — Ibid, Vol - I, Page - 491

৬৭। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ১৬১

৬৮। Buchanan Francis — Account of the District or Zilla of Rangpur, BK-II, Page - 133 - 34

৬৯। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page - 73

৭০। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ১৬৮

৭১। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ১৭৩

৭২। Nesfied J.C. — The Musher as of central and upper India.

৭৩। H.H. Risley — Ibid, Page - 166

৭৪। কালীপদ লাহিড়ী — তদেব, পৃঃ - ৪৩

৭৫। নীহার রঞ্জন রায় — বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, পৃঃ - ৫১

৭৬। H.H. Risley — Ibid, Vol - II, P - 64

৭৭। M.O. Centre — Final Report on the survey and settlement operations in the District of Malda - 1928 - 35 (Bengal, 1938), Page - 45

৭৮। ডঃ মীর রেজাউল করিম — শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃঃ - ১

৭৯। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ২

৮০। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ৪

৮১। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ১৬

৮২। ডঃ সুজয় ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৩২

৮৩। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ১৬

৮৪। ডঃ সুজয় ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৩৩

৮৫। District Statistical Handbook, Maldah, 2006, TABLE - 2.3

৮৬। Ditto, TABLE - 2.9

৮৭। Ditto, TABLE - 2.3

৮৮। ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় — তদেব, পৃঃ - ৩০

৮৯। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ৩০

৯০। প্রাগুক্ত — আমার কথা।

৯১। District Statistical Handbook, Maldah, 2006 at a glance, Page - iii

৯২। সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত — মালদহ জেলার জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস, মালদহ চর্চা, পৃঃ - ১০৭

৯৩। District Statistical Handbook, Maldah, 2006 TABLE - 2.8

৯৪। Census of India 1971, West Bengal, Maldah District, Page- 9

৯৫। Census of India 1981, West Bengal, Maldah District

৯৬। Census of India 1991, Series - 26, West Bengal Village and Town Directory, Maldah District.

৯৭। Census of India, Maldah District

৯৮। District Statistical Handbook, Maldah, 2002 & District Statistical Handbook, Maldah, 2006

৯৯। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ৩৪

১০০। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ৩৬

১০১। District Statistical Handbook, Maldah, 2006 at a glance, Page (iv)

১০২। পঞ্চায়েত রজত জয়ন্তী, মালদা, ১৯৭৬

১০৩। Census of India 1991, Series - 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, Page - XVII

১০৪। District Statistical Handbook, Maldah, 2006, Table - 2.1

১০৫। G.A. Grierson — Linguistic Survey of India, Vol - V, Part - I, Page - 119

১০৬। G.A. Grierson — Ibid, Vol - V, Part - II, Page - 180

১০৭। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page - 64

১০৮। B. Roy — Census 1961, District Census.

১০৯। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page 64 - 65

১১০। B. Roy — Ibid, Page - XXVIII

১১১। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, Page - 65

১১২। B. Ray — Ibid - page - XXVIII

১১৩। Ibid — Page - XXVIII

১১৪। ডঃ মীর রেজাউল করিম — উত্তর-মালদহের ভাষা ঃ একটি সমীক্ষা, উত্তরবঙ্গের ভাষা (রতন বিশ্বাস সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ - ৫৪৮

১১৫। ডঃ সুজয় ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৫২

১১৬। B. Roy, Ibid, Page - XXVIII

১১৭। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস — সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ - ১৮৫

১১৮। রাজশেখর বসু — চলন্তিকা, পৃঃ - ১৭৮

১১৯। সুবোধ চৌধুরী, ডোমনি, পৃঃ - ৩৮ - ৩৯

১২০। Jatindra Chandra Sengupta — Ibid, page - 65

১২১। শ্রীসুকুমার সেন — ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ - ৯ - ১০

১২২। B. Roy — Ibid, Page - 146, 147, 148, 149

১২৩। সিদ্ধার্থ গুহরায় — তদেব, পৃঃ - ১০ - ১১

১২৪। ডঃ সুজয় ঘোষ — তদেব, পৃঃ - ৫২

১২৫। G.A. Grierson — Ibid, Vol - V, Part - II, Page - 179

১২৬। ডঃ সুনীল চন্দ্র মণ্ডল — তদেব, পৃঃ - ১৯

১২৭। প্রাগুক্ত — পৃঃ - ১৭

১২৮। B. Ray — Ibid, page - XXVIII